# ত্রিপুরায় মাণিক্য রাজাদের কীর্তি

মৃণালকান্তি দেবরায়
শ্যামল চৌধুরী

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

# ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদের কীর্তি

মৃণালকান্তি দেবরায়
ও
শ্যামল চৌধুরী

TRIBAL RESEARCH & CULTURAL INSTITUTE
GOVERNMENT OF TRIPURA

Tripurar Manikya Rajader Kirti
Mrinal Kanti Debroy & Shyamal Chowdhury

Published by :
Tribal Research and Cultural Institute
Government of Tripura, Agartala

© Tribal Research and Cultural Institute
Government of Tripura, Agartala

First edition : 28th February, 2020

Cover Design : Pushpal Deb

Type Settings : Shabdachitra

Printed by : Kalika Press Pvt. Ltd., Kolkata

ISBN : 978-93-86707-28-4

Price : ₹ 133/-

# নিবেদন

রাজমালার প্রথম খণ্ড থেকে স্পষ্ট যে, ত্রিপুর গোষ্ঠী সর্বপ্রথম অসমের নওগাঁও জেলার কপিলী নদীর তীরে রাজ্য স্থাপন করেছিল। ডিমাসা কাছাড়িদের সঙ্গে তাঁদের যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল তা যেমন রাজমালায় উল্লেখ আছে, তেমনি কাছাড়িদের ইতিহাসেও এর উল্লেখ আছে। আধুনিক ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে ত্রিপুর গোষ্ঠী বোড়ো-ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই বোড়ো ভাষী তিব্বত-বর্মী গোষ্ঠী চিনের ইয়াংসি ও হোয়াংহো নদীর উজান অঞ্চল থেকে তিব্বত এবং বর্মা হয়ে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় পৌঁছায়। তাদের আগমন সুদূর মহাভারতের যুগের আগে থেকেই ধাপে ধাপে ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

কিন্তু কখন ত্রিপুর গোষ্ঠী এই কপিলী নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তার কোন নিশ্চিত তথ্য মেলে না। তবে কাছাড়িদের সঙ্গে বিবাদে তাঁদের দক্ষিণে হটে সমতল কাছাড় এলাকায় রাজত্ব স্থাপনের পরই যে ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটে তা নিশ্চিত। সময়টা নিশ্চিত করা না গেলেও মিথিলার ব্রাহ্মণদের যে ত্রিপুররাজ আদি ধর্ম-পা শ্রীহট্টে আনয়ন করেন, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শ্রীহট্টের 'দেব' রাজবংশের পতনের পরই দ্বাদশ শতকের শেষভাগে সমগ্র কাছাড়, দক্ষিণ শ্রীহট্টের এক বিরাট অঞ্চল এবং উত্তর ত্রিপুরা জুড়ে ত্রিপুর রাজবংশ এক বৃহৎ রাজশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তা আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে পশ্চিম ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে এইসব অঞ্চলও ত্রিপুরা রাজবংশের অধিকারে চলে আসে। এই সময় থেকে ত্রিপুরার রাজারা মাণিক্য উপাধি ব্যবহার করতে থাকে। তাই রত্নমাণিক্যকে প্রথম মাণিক্য উপাধিধারী রাজা বলা যায় না। কারণ ধর্মমাণিক্য এবং মহামাণিক্য নামে তাঁর পূর্ববর্তী রাজার নাম পাওয়া গেছে।

এটা মনে রাখার দরকার যে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চন্দ্রবংশের মহিমা ছাড়াই ত্রিপুরার রাজারা, বিশেষত, মাণিক্য পর্যায়ে, স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এছাড়া তাঁদের এত দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ধন্যমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, কল্যাণ মাণিক্যের মতো রাজারা সমানে সমানে বাংলার নবাব অথবা মোগলদের সঙ্গে লড়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম যেমন হয়েছেন, নিজেদের প্রভাবের ক্ষেত্রটিকে আরও প্রসারিত করেছেন অথবা তার প্রয়াসও করেছেন। একই সঙ্গে ত্রিপুরা রাজারা বাংলা ভাষা, ভাস্কর্য-শিল্প ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানও রেখেছেন। আধুনিক যুগে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

এইসব কীর্তির নিদর্শনগুলি ছড়িয়ে আছে পূর্বতন রাজধানী উদয়পুর, চাকলা-রোশনাবাদ ও অন্যান্য অধিকৃত জায়গায়, পরবর্তী রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের আরও বিভিন্ন স্থানে। ত্রিপুর রাজাদের এক সময়ের লীলাক্ষেত্র সমতল কাছাড় অথবা দক্ষিণ শ্রীহট্ট অঞ্চলে আরও কিছু নিদর্শন থাকলেও তাদের অনুসন্ধান এখনও হয়নি। হলেও ভগ্নস্তূপ ছাড়া আর কিছুই হয়তো পাওয়া যাবে না।

যেসব কীর্তির চিহ্নগুলি এখনও আছে, ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে লিখতে গিয়ে অনেকেই খুব সংক্ষেপে তার বিবরণ দিয়েছেন অথবা খণ্ডিত খণ্ডিত বিষয় নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থও পাওয়া যায়। তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আকর গ্রন্থ হিসেবে কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত শ্রীরাজমালা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে ত্রিপুরার রাজাদের এইসব কীর্তির একটা সার্বিক অথচ সংক্ষিপ্ত রূপ বৃহৎ অথবা স্বল্প পরিসরে একত্রে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনও প্রয়াস এখনও নজরে আসেনি। এই অভাবটাকে অনুভব করেই গ্রন্থকারদ্বয়ের এই দুঃসাহসী প্রয়াস।

এক্ষেত্রে গ্রন্থকারদ্বয়ের ভূমিকা অনেকটা সংগ্রাহকের মতো, বিভিন্ন আকর গ্রন্থগুলি থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। মূলত এই গ্রন্থে ত্রিপুরার রাজাদের মূল অবদান অথবা কীর্তিগুলিই স্থান পেয়েছে। এই প্রয়াস কতটা সফল, তা পাঠকদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া গেল।

গ্রন্থকারদ্বয়<br>
মৃণালকান্তি দেবরায়<br>
শ্যামল চৌধুরী

# প্রকাশকের কথা

'ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদের কীর্তি' গ্রন্থটির রচনায় নিয়োজিত শ্রী মৃণালকান্তি দেবরায় ও শ্রী শ্যামল চৌধুরী মহাশয়গণের দ্বায়বদ্ধতার কথা স্মরণে রেখেই সুধী পাঠক সমাজের কাছে যথাযথ মূল্যায়নের জন্য এই ঐতিহাসিক দলিলটি তুলে ধরা হলো।

মাণিক্য রাজাদের সার্বিক দিকগুলো মূল্যায়নে গবেষণামূলক গ্রন্থটি আশা করি বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজবোধ্য গ্রন্থটি পাঠকের কাছে সঠিক পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

২৪.০২.২০২০

**(ধনঞ্জয় দেববর্মা)**
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
লেইক চৌমুহনী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা

তারিখ, আগরতলা
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ ইং

# সূচিপত্র


১। মাণিক্য রাজাদের তালিকা ৯

২। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ১৩

৩। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ৫৯

৪। স্থাপত্য-শিল্প ৮৫

৫। জলাশয় প্রতিষ্ঠা ১০৯

৬। গ্রন্থ-সূত্র ১২৫

# মুখবন্ধ

ত্রিপুরার দুই স্বনামধন্য লেখক শ্রী মৃণালকান্তি দেবরায় ও শ্রী শ্যামল চৌধুরী "ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদের কীর্তি" গ্রন্থে যেভাবে ত্রিপুরার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বহমান ধারাকে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। সাধারণ মানুষ অনেক সময়েই আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকেন। দিন আনি, দিন খাই-এর বাইরে তাদের ভাবনা চিন্তা বিশেষ কাজ করে না। আর যাঁরা মধ্য শিক্ষিত, এমনকি উচ্চশিক্ষিত ও, তাঁরাও মাঝেমাঝে ভুলে যান কোন পরম্পরার তাঁরা উত্তরসুরী।

"ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদের কীর্তি" গ্রন্থটি আমাদের সেই বিস্মরণের মোহজাল থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে। কাজটি খুব সহজ ছিল না। প্রচন্ড পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্রিপরার প্রতি গভীর ভালাবাসা, তাঁদের একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে বলে মনে করি। যেভাবে তাঁরা একটির পর একটি অধ্যায়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজাদের, সঙ্গে অনেক সময় রাণীদেরও, কীর্তি ও অবদানকে পাঠকদের গোচরে আনতে প্রয়াসী হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সময়টাও খুব কম নয়। মোটামোটিভাবে পঞ্চদশ শতকের আরম্ভ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত—ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী ও গৌরবগাথা শ্রদ্ধেয় শ্রীমৃণালকান্তি দেবরায় ও শ্রী শ্যামল চৌধুরী তাঁদের লেখায় তুলে ধরেছেন। এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। তাঁদের প্রদত্ত পরিসংখ্যানগুলি কৌতুহলী পাঠকদের, বিশেষতঃ গবেষকদের, প্রভূত সাহায্য করবে বলে মনে করি। প্রাসাদ, দেবালয়, মঠ ইত্যাদির নির্মাণ ও গঠনশৈলী থেকে শুরু করে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জলাশয় খনন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা— সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন গ্রন্থকারদ্বয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় 'রাজমালা' ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি। রাজন্য ত্রিপুরার একটি উন্নত ইতিহাস তাঁরা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

জাতি-উপজাতির মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে বইটির একটি কার্যকরী ভূমিকা থাকবে বলে মনে করি এবং গ্রন্থটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে এই আশা করি।

১৯ শে ডিসেম্বর, ২০১৮

**অমিতা চৌধুরী**
প্রাক্তন রীডার,
উইমেন্স কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

# ১ মাণিক্য রাজাদের তালিকা

১। মহামাণিক্য (পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভ)
২। ধর্মমাণিক্য/ডাঙ্গর ফা (১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ)
৩। রত্নমাণিক্য (১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দ-?)
৪। প্রতাপমাণিক্য (?)
* ৫। বিজয়মাণিক্য (১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দ)
৬। মুকুটমাণিক্য (১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ)
৭। প্রতাপমাণিক্য (১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ)
৮। ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ)
৯। দেবমাণিক্য (১৫২৬-১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ ?)
১০। ইন্দ্রমাণিক্য (১৫৩১-১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ ?)
১১। বিজয়মাণিক্য (১৫৩২-১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ)
১২। অনন্তমাণিক্য (১৫৬৪-১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ)
১৩। উদয়মাণিক্য (১৫৬৭-১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দ)
১৪। জয়মাণিক্য (১৫৭৩-১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ)
১৫। অমরমাণিক্য (১৫৭৭-১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ)
১৬। রাজধরমাণিক্য (১৫৮৬-১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ)
১৭। যশোমাণিক্য (১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ)
*১৮। বীরভদ্রমাণিক্য (১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ)
* ১৯। ঈশ্বরমাণিক্য (১৬০০ খ্রিস্টাব্দ)
আবার, যশোমাণিক্য (১৬০০ খ্রিস্টাব্দ)
* ২০। ধর্মমাণিক্য (১৬০১ খ্রিস্টাব্দ)
আবার, যশোমাণিক্য (১৬০২-১৬১৮ খ্রিস্টাব্দ)
মোগল শাসন (১৬১৮-১৬২১ খ্রিস্টাব্দ)
ও পরে রাজাহীন অবস্থা (১৬২১-১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ)
২১। কল্যাণমাণিক্য (১৬২৩-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ)

---

* এই রাজাদের নাম রাজমালায় নেই।

২২। গোবিন্দমাণিক্য (১৬৬০-১৬৬১ খ্রিস্টাব্দ)
২৩। ছত্রমাণিক্য (১৬৬১-১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দ)
আবার গোবিন্দমাণিক্য (১৬৬৭-১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ)
২৪। রামমাণিক্য (১৬৭৬-১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ)
২৫। নরেন্দ্রমাণিক্য (১৬৮২-? খ্রিস্টাব্দ)
আবার রামমাণিক্য (?-১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ)
২৬। রত্নমাণিক্য (১৬৮৫-১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দ)
আবার নরেন্দ্রমাণিক্য (১৬৯৩-১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ)
আবার রত্নমাণিক্য (১৬৯৫-১৭১২ খ্রিস্টাব্দ)
২৭। মহেন্দ্রমাণিক্য (১৭১২-১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ)
২৮। ধর্মমাণিক্য (১৭১৩-১৭২৬ খ্রিস্টাব্দ)
২৯। জগতমাণিক্য (১৭২৬-১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ)
আবার, ধর্মমাণিক্য (১৭২৮-১৭২৯ খ্রিস্টাব্দ)
৩০। মুকুন্দমাণিক্য (১৭২৯-১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ)
৩১। জয়মাণিক্য (১৭৩৯-১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ)
৩২। ইন্দ্রমাণিক্য (১৭৪৪-১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দ)
আবার জয়মাণিক্য (১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দ)
৩৩। বিজয়মাণিক্য (১৭৪৬-১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ)
৩৪। লক্ষ্মণমাণিক্য [সমসের গাজি এবং তার অনুচর আবদুল রাজ্জাক-এর অধীনে ত্রিপুরা রাজ্য ১৭৪৮-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থাকে। ওই সময়ে গাজি ত্রিপুর রাজবংশের একজনকে লক্ষ্মণমাণিক্য নামে কিছুদিনের জন্য সিংহাসনে বসায়।]
৩৫। কৃষ্ণমাণিক্য (১৭৬০-১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ)
এবং জাহ্নবী দেবী (১৭৮৩-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ)
৩৬। রাজধরমাণিক্য (১৭৮৫-১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ)
৩৭। রামগঙ্গামাণিক্য (১৮০৪-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ)
৩৮। দুর্গামাণিক্য (১৮০৯-১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ)
আবার, রামগঙ্গামাণিক্য (১৮১৩-১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ)
৩৯। কাশীচন্দ্রমাণিক্য (১৮২৬-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ)
৪০। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য (১৮৩০-১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ)
৪১। ঈশানচন্দ্রমাণিক্য (১৮৪৯-১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ)

৪২। বীরচন্দ্রমাণিক্য (১৮৬২-১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ)
৪৩। রাধাকিশোর মাণিক্য (১৮৯৬-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ)
৪৪। বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য (১৯০৯-১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)
৪৫। বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য (১৯২৩-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)
৪৬। কিরীটবিক্রমকিশোর মাণিক্য (১৯৪৭-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

* কিরীট বিক্রম কিশোর মাণিক্য নাবালক থাকায় মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী রিজেন্ট হিসেবে রাজ্য শাসন করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়।

# ২ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বাংলা ভাষার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের নৈকট্য প্রায় হাজার বছরের। কোচবিহার, কৃষ্ণনগর, আরাকান অথবা কাছাড়ের রাজাদের আনুকূল্যে বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কিছু সময় জুড়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু ত্রিপুরার রাজাদের মতো এক বিশাল সময়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে।

বাংলা ভাষায় লেখা ত্রিপুরার প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম 'রাজাবলী'। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র দ্বারা এই গ্রন্থটি এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটি বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম গদ্য গ্রন্থের অন্যতম এবং ত্রিপুর বংশীয় রাজাদের বিবরণে পূর্ণ। ডঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক এক প্রবন্ধে এই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধে এই গ্রন্থের নাম করেছেন। ডঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র গ্রন্থটিকে প্রায় ৯০০ বছরের পুরানো বলে স্থির করেছেন। তবে বইটি বর্তমানে পাওয়া যায় না, এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তা হারিয়ে গেছে। এই বইটি প্রসঙ্গে উমাকান্ত একাডেমির প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—'পরম পূজ্যপাদ মদধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তদীয় ''সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ'' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে ''বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস'' নামক সুলিখিত ও অনুসন্ধান বহুল অধ্যায়ে উল্লিখিত পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা একান্তই কর্তব্য বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন—''যাহা হউক, এক্ষণ হইতে ৯০০ বছর পূর্বে ''ত্রিপুরা রাজাবলী'' নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হইয়াছে। উহা ত্রিপুরা রাজ বংশীয়দিগের বিবরণে পরিপূর্ণ এবং ৯০০ বছরের প্রাচীন বলিয়া কথিত। অতএব এক প্রকার স্থির করা যাইতে পারে যে, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে বঙ্গ ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। ... প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্র লাল মিত্র ''বিবিধার্থ সংগ্রহ'' নামক পুরাতন মাসিকপত্রে বঙ্গভাষার উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধে উক্ত পুস্তকের নাম নির্দেশ করিয়াছিলেন।

কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে ইহা অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া কথিত। বস্তুতঃ অনেক চেষ্টা করিয়া এই পুস্তকখানি আমরা দেখিতে পারি নাই।'

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে শ্রীহট্টের ভাটেরার তাম্র ফলকে উল্লিখিত 'দেব' রাজবংশের পতনের পরই বরাক ও দক্ষিণ শ্রীহট্ট অঞ্চলে ত্রিপুর রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে কৌম অবস্থা থেকে বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তখনই তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিবিড় পরিচয় ঘটে। এই বিশাল অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে বংশ গরিমা ও প্রাচীনত্বের মাধ্যমে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজনেই এই 'রাজাবলী' গ্রন্থের সৃষ্টি।

কাছাড় এলাকায় ত্রিপুরার রাজাদের অবস্থানের আরেকটি তথ্য মেলে অসমিয়া লেখক মাধব কন্দলীর অনূদিত রামায়ণ গ্রন্থে। এতে লেখক তাঁর আত্মপরিচয়ে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে 'মহামাণিক্য বরাহ রাজা'-এর উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত মাধব কন্দলী এই মহামাণিক্য রাজার সভাকবি ছিলেন। এই মাধব কন্দলী শঙ্করদেবের (১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ববর্তী। কবির এই পৃষ্ঠপোষক মহামাণিক্য সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আধুনিক অসমিয়া পণ্ডিতদের মতে এই মহামাণিক্য কাছাড়ের রাজা এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। হেমচন্দ্র গোস্বামী ও কনক শর্মার মতে, ওই মহামাণিক্য ১৩৫৩ থেকে ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ডিমাপুরে রাজত্ব করেন। কিন্তু কাছাড়ের রাজাদের কোনও বংশ তালিকায় মহামাণিক্য নামের কোনও রাজা নেই।

অপরপক্ষে, ত্রিপুরার রাজমালায় মহামাণিক্য নামে এক রাজার নাম আছে, যিনি ধর্মমাণিক্যের পিতা। ধর্মমাণিক্যের তাম্রশাসন ও রাজমালায় উভয় ক্ষেত্রেই ১৩৮০ শকের উল্লেখ আছে। তাই 'Assamese Grammar and Origin of Assamese Language' গ্রন্থের প্রণেতা ভাষাতাত্ত্বিক কালিরাম মেধি মাধব কন্দলীর পৃষ্ঠপোষক রাজা মহামাণিক্যকে ত্রিপুরার রাজা মহামাণিক্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। ওই সময়ে অসমিয়া ভাষা বাংলা ভাষা থেকে পৃথক হয়নি। তাই মাধব কন্দলী এই অঞ্চলের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যসহ প্রাচীন বাংলাতেই তাঁর রামায়ন রচনা করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত ভাষার একটি নমুনা—

বাল্মীকি রচিলা শাস্ত্র গদ্যপদ্য ছন্দে।

তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে।।
আপোনার বুদ্ধি অর্থ যিমতে বুজিলোঁ।
সংক্ষেপ করিয়া তাক পদ বিচারিলোঁ।।
সমস্ত রসককোনে জানিবাক পারে।
পাখী সব ঔরয় যেন পখা অনুসারে।।
কবি সব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে।
কতো নিজ কতো লম্ভা কথা অনুসারে।।
দৈববানী নুহি ইটো লৌকিকহে কথা।
এতেক ইহার দোষ নলৈবা সর্বথা।।

প্রকৃতপক্ষে ওই সময়ে ত্রিপুরার ভরকেন্দ্র কাছাড় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, প্রথম ধর্মমাণিক্য ওরফে ডাঙ্গর ফা-এর আমল থেকে উদয়পুর রাজধানী হিসেবে গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে। ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪৩১-১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ। তাই মহামাণিক্যের রাজত্বকাল আনুমানিক চতুর্দশ শতকের শেষভাগ থেকে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ বলে ধরা যায়, যা মাধব কন্দলীর সময়কালের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে মিলে যায়। তাই ত্রিপুরার রাজাই যে মাধব কন্দলীর পোষ্টাই রাজা মহামাণিক্য তা নিশ্চিত করা যায়।

ত্রিপুরার রাজাদের পরবর্তী অবদান পয়ার ছন্দের রচিত কাব্যগ্রন্থ ''রাজমালা''। ত্রিপুর রাজবংশের গরিমা ও ইতিহাস প্রচারে ''রাজাবলী'' নামক গদ্যগ্রন্থটি প্রচারের পক্ষে মোটেও আদর্শ ছিল না। তাই বাংলা ভূখণ্ডের অনুকরণে পয়ারছন্দে তা রচনা অনিবার্য ছিল। তাই পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি ডাঙ্গর ফা ওরফে ধর্মমাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় চন্তাই দুর্লভেন্দ্র-এর সহযোগিতায় দুই রাজপণ্ডিত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর বাংলায় পয়ার ছন্দে 'রাজমালা'-র প্রথম খণ্ডটি রচনা করেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলা হয়েছে—

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য নাম ত্রিপুর চূড়ামণি।
দানধর্ম্মে শুচরিত্রে রাজসিরোমণি।।
... ... ....

সেই রাজা একদিন বসি সিংহাসনে।
আপনা বংশের কথা হইয়া গেল মনে।।

বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

আপনার সভাসদ ব্রাহ্মণ কুমার।
বাণেস্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার।।
ইন্দ্রের সভাতে জেন বৃহস্পতি গনি।
নানা সাস্ত্র জানেন বিক্ষ্যাত চূড়ামনি।।

আবার চোন্তাই দুর্লভেন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—

আর দুল্লভেন্দ্র নাম চোন্তাই প্রধান।
রাজ বংস কথাতে বড়ই সাবধান।।
... ... ...
সে জেই কথা জানে অন্যেতে না ঘটে।।

তাই রাজা তাদের কাছ থেকে তাঁর বংশের কথা শুনতে চাইলেন

এ তিনেতে জিজ্ঞাসা করিল গুণমনি।
আমার বংসের কথা কহ কিছু সুনি।।

এরপর—

রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয়।।
অবধান কর মহারাজ চূড়ামণি।
তোমার বংসের কথা কহিব জে জানি।।

প্রথম খণ্ডে রাজা ত্রিপুর ও ত্রিলোচনের বিবরণ এবং শেষাংশে সেংথুম ফা-এর বিবরণ ছাড়া, অন্য রাজাদের নাম উল্লেখ ছাড়া প্রায় কোনও বিবরণ নেই বলা চলে। এ থেকে মনে হয় 'রাজাবলী' গদ্যগ্রন্থটির অনুসরণেই তা কুলজী গ্রন্থ হিসেবে রচিত হয়েছিল। পয়ার ছন্দে লিখিত হলেও একঘেয়েমি

কাটাবার জন্য ত্রিপদী ও দ্বিপদীর ব্যবহার আছে। ত্রিলোচনের শিশু অবস্থার বর্ণনায় উপমার ব্যবহার ও ভাষার মাধুর্য লক্ষণীয়---

এহি গুণবর রূপের সাগর
মন ভোলাইল জত।।
এহি রূপ হেরি নয়ন চকোরি
সুধা পীয়াসিনী হইয়া।
বারে২ চাহে প্রাণ জুড়াহে
অনিমেখে রহিল চাহিয়া।।
রাজার কোঁয়র কামের দোসর
সিহরি উঠএ দেখী।
ছালিয়া এমন হয় কেহত না কয়
বিপরিত তিন আক্ষী।।

রাজমালার এই প্রথম খণ্ডটি রাজা দৈত্য থেকে শুরু করে মহামাণিক্য পর্যন্ত। রাজমালার দ্বিতীয় খণ্ডটি লেখা হয় অমরমাণিক্যের আমলে। এতে ধর্মমাণিক্য থেকে শুরু করে জয়মাণিক্য পর্যন্ত। মহারাজ অমরমাণিক্য রণচতুর নারায়ণ নামক ১০৫ বৎসর বয়স্ক সেনাপতির কাছে এই রাজাদের বৃত্তান্ত শুনেন---

অমরমাণিক্য রাজা স্থির করি মন।
জিজ্ঞাসা উচিত রণচতুর নারায়ণ।
একসত পঞ্চবর্ষ বয়স তুহার।
স্থিরমতি গুণবন্ত ধর্য্যতা অপার।।
শুন ২ বলি রণচতুর নারায়ণ।
রাজবংস কথা কিছু কহত আপন।।
বয়সে বিসিষ্ট বট ত্রিপুর সন্ততি।

তোমি জান ভাল পুর্ব্ব রাজাগণ নিতি।।

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য পরে জত রাজা হৈল।

জে রূপে সে রাজা সবে প্রজাকে পালিল।।

কোন রাজা কিবা কর্ম্ম করিল তখন।

কহত সে শব কথা সুনিব অখন।।

নৃপতির বচনে কহন্ত সেনাপতি।

পুর্ব্বের প্রসঙ্গ বলি সুন মহামতি।।

শ্রীধর্ম্মমাণিক্যাবধি জত রাজা হৈল।

অনুক্রমে সেনাপতি সকল কহিল।।

রাজমালা অনুসারে, তৃতীয় খণ্ড গোবিন্দমাণিক্য রচনা করান। এতে অমরমাণিক্য থেকে শুরু করে কল্যাণমাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া আছে। শ্রীরাজমালায় এর রচয়িতা সিদ্ধান্তবাগীশ বলে উল্লেখ আছে। ইনি রাজসভায় দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সেন এর নাম গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ বলে সনাক্ত করেছেন। অপরপক্ষে রামনারায়ণ দেবের রাজমালায় কথক হিসেবে মন্ত্রীকে উল্লেখ করা হয়েছে---

গোবিন্দ মাণিক্য রাজা বড় পুণ্যবান।

পূর্ব ২ রাজা সবের সুনিয়া বাখান।।

... ... ...

অমরমাণিক্য হতে রাজা না লিখীল।।

তারপরে জে জে রাজা হইল ত্রিপুরে।

কেবা কোন কর্ম্ম কৈল কহ মন্ত্রিবরে।।

রাজমালার এই তিনখণ্ডের কোনটিরই মূল পুঁথি পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, বহুদিনের জীর্ণ পুঁথিকে আবার নতুন করে বার বার নকল করে তাকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল মধ্যযুগের রীতি। আর নতুন খণ্ড লেখার সময় পুরাতন খণ্ডগুলিকে

একই সঙ্গে নতুন করে হাতে লিখে নেওয়া হত। রাজমালাতেই এর পুষ্টি আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে বলা হয়েছে---

এত জদি রণচতুর নারায়ণে কৈল।।

অমরমাণিক্য রাজা সন্তোস হইল।।

পূর্ব্ব ২ নৃপতির সুনিলেক কথা।

দত্যখণ্ড পুথি তবে করিলেক গাঁথা।

দুর্য্যখণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে।

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে।।

সেই পুস্তক পরে গোবিন্দদেবে পাইল।

তাহার পরে রাজা পুস্তক গাঁথিল।।

তবে নতুন খণ্ড রচনার সময় সমগ্র অংশটির বেশকিছু প্রতিলিপি প্রস্তুত করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে রাখা হত। রাজমালার চতুর্থ খণ্ড রচনার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এরই একটি প্রতিলিপি জনৈক মণীন্দ্র গাঙ্গুলীর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় স্থান পায়। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক এই রাজমালা পুঁথিটি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়ে জনসমক্ষে আসে। এ পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে প্রাচীন 'রাজমালা'।

এ থেকে জানা যায় যে, রাজমালার চতুর্থ খণ্ডটি মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের আমলে (১৭৬০-৮৩ খ্রিস্টাব্দ) রচিত হয়। মুখবন্ধে দেখা যায় যে, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের আদেশে কোনও এক বৃদ্ধ বয়সী বিশ্বাসনারায়ণ এই খণ্ড রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম রত্নমাণিক্য (১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দ-?) বাংলাদেশ থেকে করণ সম্প্রদায়ের বড় খাণ্ডব ঘোষ ও পণ্ডিতরাজ এবং চিকিৎসক জয়নারায়ণ সেনকে আনয়ন করে বঙ্গের অনুকরণে সেরেস্তা গঠন করেন। তাঁদের বংশধরেরাই বংশানুক্রমে 'বিশ্বাস' উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে যাবতীয় লেখাপড়ার কাজ করতেন। নিশ্চিতভাবেই রাজমালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডও এদের দ্বারাই লিখিত হয়েছিল। রাজমালার চতুর্থখণ্ডের প্রথমেই আছে---

কৃষ্ণমাণিক্য রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
একদিন বসি আছে লইয়া পাত্রগন।।
পুনরুক্তি উজিরেত জিজ্ঞাসে রাজন।
রাজমালা প্রস্তাব হইল স্বরণ।।
উজীরে কহেন রাজা করি নিবেদন।
গোবিন্দমাণিক্য ছিল ধর্ম্মপরায়ণ।।
জয়ধ্যা বিবরণ পূর্ব্বের লিখন।
তারপরে লিখাইব সার বিবরণ।।
বৃদ্ধেত আছ-এ জে বিস্বাসনারায়ণ।
বিদ্বান হএ জানে আইন্ধ বিবরণ।।
রাজআজ্ঞা হইলেক ডাকে মন্ত্রিবর।
গোবিন্দমাণিক্য লিখ সার আবান্তর।।
আজ্ঞা সুনি কহিল বিস্বাষনারায়ণ।
সর্ব্বকথা নহি জানি সব বিবরণ।।
পুনর্ব্বার মহারাজ বলিল তখন।
শ্রুতিদৃষ্টি লিখ পুথি দড় করি মন।।
আজ্ঞা সুনি লিখিবার আরম্ভ করিল।
ভাব্য মন দুর করি সন্তোষ হইল।।
রাজআজ্ঞা মন্ত্রিআজ্ঞা সিরেত বান্দিয়া।
লিখীলেক বিবরণ দড়চিত্ত হইয়া।।

তুলট কাগজে প্রস্তুত এই পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৫ (তবে ৪২-তম পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি)। নকলকারী হিসেবে রামনারায়ণ দেবের নাম ৪৯ এবং ৫৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া গেছে। পুস্তকের শেষে ভনিতায় বলা হয়েছে---

এহি সব প্রস্তাব হৈল ...।

বিস্বাষনারায়ণ গাথা লিখীল বিশেষ।।

... ... ...

আগরতলা উজিরেত পুস্তক ...।।

শূন্য অংশগুলির পাঠ উদ্ধার করা যায়নি। শেষ লাইনটি দেখে মনে হয়, মূল পুঁথিটি আগরতলায় উজিরের পুস্তকালয়ে ছিল। সেই পুঁথিটি দেখেই রামনারায়ণ দেব প্রতিলিপি তৈরি করেন। এই পুঁথির প্রথম তিনটি খণ্ড সুগঠিত এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের একটি নাম আছে, প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণে ত্রিপদী ও দ্বিপদীর ব্যবহারও আছে। কিন্তু চতুর্থ খণ্ডের পুরোটাই পয়ার ছন্দে লেখা, রাজাদের বিবরণ সংক্ষিপ্ত এবং সবটাই একটানা লেখা, আগের খণ্ডগুলির মত অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত নয়। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই চতুর্থখণ্ডের লেখক আগের খণ্ডগুলির লেখকদের মত দক্ষ ছিলেন না।

এই 'রাজমালা' পুঁথিটির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বর্ণাশুদ্ধি প্রচুর, প্রতিটি লাইনেই প্রচুর বানানের ভুল যে কোনও পাঠককেই বিস্মিত করবে। মধ্যযুগে বাংলাদেশে যে পাঠশালাগুলি ছিল, তাতে গুরুমশাই-দের শিক্ষায় বানানের কোনও বালাই ছিল না। এই ধরনের পাঠশালা যে ত্রিপুরায়ও সম্প্রসারিত ছিল এবং এখানকার সেরেস্তার সাধারণ কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশোনা যে এই পাঠশালাতেই হতো, এই রাজমালা তার প্রমাণ। তবে বর্ণাশুদ্ধি থাকলেও ব্যবহৃত ভাষা অবশ্যই শোভন ও মনোগ্রাহী। অবশ্য এতে মধ্যে মধ্যে দেশী শব্দও লক্ষ্য করা যায়। তবে মধ্যযুগের রচনা হওয়ায় বিশেষত দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে বেশকিছু আরবি-ফার্সি শব্দও দেখা যায়। যেমন—

এহি সব কথা জদি রাজাতে কহিল।

খিলায়ত দিয়া তাকে বিদায় করিল।।

কৃষ্ণমাণিক্যের মন্ত্রী জয়দেব উজীরের পুত্র দুর্গামণি উজীর কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রামগঙ্গামাণিক্যের দ্বিতীয় বারের আমলের সময় (১৮১৩-১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ) দুর্গামণি উজীর পুনরায় রাজমালার চতুর্থ খণ্ডটি

রচনা করেন। তিনি কাশীচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৬-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ) রাজমালার পঞ্চম খণ্ডটি রচনা করেন। এতে রাজধরমাণিক্য থেকে রামগঙ্গামাণিক্য পর্যন্ত লেখা রয়েছে। এরপর কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের আমলে (১৮৩০-১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ) রাজমালার ষষ্ঠ খণ্ডটি রচনা করেন। এতে রামগঙ্গামাণিক্য থেকে কাশীচন্দ্র মাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ আছে। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের আমলে রাজমালার প্রথম চারটি খণ্ড কালীপ্রসন্ন সেনের সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়। কিন্তু এরপর তাঁর মৃত্যু হওয়ায় বাকি দুটি খণ্ডের আর মুদ্রণের সৌভাগ্য ঘটেনি।

দুর্গামণি উজীর রাজমালার প্রাচীন তিনটি খণ্ডের বেশকিছু সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজন করেছেন বলে চতুর্থ খণ্ডের মুখবন্ধে জানিয়েছেন—

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত।
প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।।
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত।
সেই কারণে লোকে নাহি বুঝে যত।।
ত্রিপুরা রাজ্যের নাম ত্রিপুর যে মতে।
ত্রিপুর রাজার প্রমাণ না লিখিছে তাতে।।
বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি।
তাহাকে সুধিল পুণি উজীর দুর্গামণি।।
মহাভারতাদি তন্ত্র করি অন্বেষণ।
প্রমাণ লিখিল তার বেদ নিরূপণ।।
এহাতে দ্বিরুক্তি যদি কাহার জন্ময়।
পুরানাদি দর্শিলে যে ঘুচয়ে সংশয়।।
পুরাতন রাজমালা আছয়ে বিদিত।
ইহা সঙ্গে মিলাইলে বুঝিবে নিশ্চিত।।

এই মুখবন্ধ থেকে জানা যায়, ১২৩৮ ত্রিং অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে দুর্গামণি রাজমালার প্রথম তিনটি খণ্ডের পরিমার্জনা করেন। কিন্তু আমাদের কাছে সর্বাধিক প্রাচীন যে রাজমালাটি (অর্থাৎ রামনারায়ণ দেবের রাজমালা। যা অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের প্রথম অংশে কৃষ্ণমাণিক্যের আমলে রচিত হয়েছিল) আছে তার ক্ষেত্রে দুর্গামণি উজীরের প্রথম তিনটি অভিযোগ খাটে না। তাই এটা স্পষ্ট যে, দুর্গামণি উজীর রাজমালার আরও প্রাচীন উৎসে পৌঁছেছিলেন।

বাংলায় রাজমালার প্রথম খণ্ড ধর্মমাণিক্যের আমলে রচনার সঙ্গে সঙ্গে একটি সংস্কৃত ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজরত্নাকর' রচিত হয়। এতে রাজমালার মতই মহারাজ দৈত্য থেকে বর্ণনা শুরু। কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য।

ধর্মমাণিক্য-পরবর্তী সাহিত্য কর্মের উদাহরণ মেলে ধন্যমাণিক্যের আমলে (১৪৯০-১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁরই অনুপ্রেরণায় জনৈক রাম কবি দ্বারা 'প্রেত চতুর্দশী'র বঙ্গানুবাদ হয়। এছাড়া তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের 'যাত্রারত্নাকরনিধি' ও 'উৎকল খণ্ড পাঁচালী'-এরও অনুবাদ করান। তাঁর সঙ্গে মিথিলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শ্রীরাজমালা অনুসারে তিনি মিথিলা থেকে নৃত্য ও গীতনিপুণ শিল্পী আনিয়ে স্থানীয়দের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর রাজসভায় ব্রজবুলিরও চর্চা হত। তাঁরই এক সভাকবি রচিত বিদ্যাপতি পদাবলির পুঁথি নেপালে আবিষ্কৃত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ধন্যমাণিক্যের সভাকবি রচিত এই পদাবলীর উল্লেখ করেছেন—

বৈরিহু কে এক দোষ মরিস অ
রাজ পণ্ডিত জ্ঞান
বারি কমলা কমল রসিয়া
ধন্যমানিক জান।

পরবর্তী সময়েও ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজাদের রাজসভায় বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা চালু থাকলেও এ সম্পর্কে কোনও তথ্য কোনও উৎসে পাওয়া যায় না। তাঁদের আনুকূল্যে অন্যান্য রচনা বা অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা যে ছিল না, তা বলা যাবে না। রত্নমাণিক্যের আমলে (১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দে) বাংলাদেশ

থেকে যে বিশাল এক সংখ্যায় বাঙালিদের উদয়পুর অঞ্চলে বসতি হয়েছিল, তারাই এই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ধন্যমাণিক্যের আমলের ওই তিনটি অনুবাদ সাহিত্যের মতোই সেগুলি আজ কালের করালগ্রাসে হারিয়ে গেছে। অবশ্য এর মধ্যে রাজমালার দ্বিতীয় খণ্ডটি অমরমাণিক্যের আমলে (১৫৭৭-৮৬ খ্রিস্টাব্দ) রচিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী কালের অনুবাদ সাহিত্য কর্মের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের আমলে (১৬৬১, ১৬৬৭-৭৬ খ্রিস্টাব্দ) বাংলায় 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ'-এর অনুবাদ হয়।

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য নরেশ্বরে।
নারদীয় অর্থ সব লোকে বুঝিবারে।।
পাঁচালী করাইল রাজা অনুমতি দিয়া।
পণ্ডিত সকলে কৈল পুরাণ দেখিয়া।।

এই পাঠে মনে হয়, একাধিক পণ্ডিতের সমন্বয়ে এই অনুবাদ কর্মটি সম্পাদিত হয়, অন্তত শ্রীরাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের এই মত। কিন্তু সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত এই কাব্যগ্রন্থের যে প্রাচীন প্রতিলিপি আছে, তাতে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সিদ্ধান্ত সরস্বতীর ভনিতা দেখা যায়,

যেমন—

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি।
তার আজ্ঞা পাইয়া শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।।
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে।
প্রথম অধ্যায় শেষ করিল যতনে।।

অথবা,

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি।
তান আজ্ঞা লভি শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।।
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তম পুরাণে।

পঞ্চম অধ্যায় ভাষা করিল যতনে।।

এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই কাব্যগ্রন্থের অনুবাদক শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী। এই অনুবাদ কর্মের কখন সূত্রপাত হয়, তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

এক নব বাণ চন্দ্র শাক পরিমাণে।

কার্ত্তিক মাসের পঞ্চ দিন অবসানে।।

সেই দিনে সভা মধ্যে বসে মহারাজে।

করিল ধর্ম্মের চিন্তা ধর্ম্মের সমাজে।

এখানে এক=১, নব=৯, বাণ=৫ এবং চন্দ্র=১ অর্থাৎ, অঙ্কস্য বামগতি অনুসারে, ১৫৯১ হয়। তাই এতে বুঝায় যে, গোবিন্দ মাণিক্য ১৫৯১ শকের (১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ৫ কার্ত্তিক এই কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদের আদেশ দিয়েছিলেন।

গ্রন্থের সবটাই হরিকথায় পূর্ণ এবং ভাষা প্রাঞ্জল ও মাধুর্যপূর্ণ। বেশিরভাগ অংশই পয়ারে লেখা, মধ্যে মধ্যে ত্রিপদীর ব্যবহার আছে। এটি আটত্রিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

গোবিন্দমাণিক্যের নির্দেশে সর্বসাধারণের পাঠের উদ্দেশ্যে ঘরে ঘরে পুঁথির প্রতিলিপি তৈরি করা হয়—

পাঁচালী প্রবন্ধ করি পুস্তক রচিল।

সর্ব্বলোকে লেখাইতে তাকে আজ্ঞা দিল।।

... ... ...

এতেক জানিয়া প্রজা প্রধান প্রধান।

জনে জনে লিখাইল পুঁথি একখান।।

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের আমলে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ এই পুঁথির সম্পাদনা করে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন।

ত্রিপুরার রাজাদের উদ্যোগে এর পরবর্তী যে কাব্য গ্রন্থটি পাওয়া গেছে, তার নাম 'চম্পক বিজয়'। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭১২

খ্রিস্টাব্দ) রচিত 'চম্পক বিজয়' কাব্যগ্রন্থটির একটি প্রতিলিপি পাওয়া গেছে। প্রতিলিপিটি আধুনিক, এটি ১৩১৩ ত্রিং (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) সনের ৭ ভাদ্র তারিখের। প্রতিলিপিতে লিপিকার ও লিপিকালের উল্লেখ আছে—'পুস্তক শ্রীরামজয় ঠাকুর স্বাক্ষর রামনারায়ণ দেব সাকিন বিদ্যাবৃট, পরগণে নুরনগর ইতি সন ১২০৬ তারিখ ১৮ই বৈশাখ।'

প্রতিলিপিটি খণ্ডিত, তাই কাব্যের রচনাকাল জানা যায় না। কাব্যের উপজীব্য বিষয় রত্নমাণিক্যের শৈশবকাল থেকে শুরু করে নরেন্দ্রমাণিক্যের রাজ্য দখল ও পরবর্তী সময়ে মীর খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির সহায়তায় রত্নমাণিক্যের রাজ্য পুনরুদ্ধার। এই মীর খাঁর সঠিক পরিচয় জানা না গেলেও তিনি যে ত্রিপুর রাজার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন তা বুঝা যায়। ওই সময়ে চম্পক রায় যুবরাজ ছিলেন। মীর খাঁ রাজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নরেন্দ্রমাণিক্যের আক্রমণে চম্পকরায় চট্টগ্রামে পালিয়ে যান ও পরে এই মীর খাঁ-র সহায়তায় তিনি রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এই জন্য এই কাব্যের নাম 'চম্পক বিজয়'।

এই কাব্যের রচয়িতা শেখ মহদ্দিন, তিনি কোথাকার লোক তা জানা যায়নি। তবে মীর খাঁ-এর আদেশেই যে এই কাব্য রচনা করেন তার উল্লেখ নানা জায়গায় দেখা যায়—

শ্রী মীর খাঁ গাজি ভুবন দুর্জয়
তাহার আদেশে দীন মহদ্দিনে কয়।

অথবা,

মীর খাঁয়ে ভুবন পূজিতে
তাহার আদেশ ধরি শির জ্ঞান মান্য করি
মহদ্দিনে করিল রচিত।

... ইত্যাদি।

মুসলমান কবির রচনা হলেও কাব্যে হিন্দু শাস্ত্র ও পৌরাণিক কাহিনি সম্পর্কে জ্ঞান এবং উপস্থাপনের ভাষা ও বর্ণনার মাধুর্য এই কাহিনিকে কোনও মুসলমান

দ্বারা রচিত বলে মনেই হয় না। রত্নমাণিক্যের বর্ণনায়—

বৈষ্ণব শরীর রাজা বিষ্ণু অবতার

অবতার জন্ম হেন ঘোষায় সংসার

নির্মল শরীর পূর্ণ যেন গঙ্গাধর গঙ্গাজল

তানে যেবা রিপু ভাবে যাহে রসাতল

অগ্নিতে অঙ্গা যেন আপনে দহয়

ভস্মময় হয় শত্রু ভাব যে করয়।

'চম্পক বিজয়' গ্রন্থখানা চার ভাগে বিভক্ত। কাব্য হিসেবে উৎকর্ষ বিচার অপেক্ষা এর ঐতিহাসিক মূল্য অধিক। এই কাব্যের যে প্রতিলিপি পাওয়া গেছে, তাতে চম্পক রায়ের রাজ উপাধি গ্রহণ অথবা রাজদ্রোহিতার অপরাধে তার প্রাণদণ্ডের কোন উল্লেখ নেই। এ থেকে বলা যায় যে, কাব্যটি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকেই রচিত।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থটি হচ্ছে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত 'ক্রিয়াযোগসার', যার একটি দুষ্প্রাপ্য প্রতিলিপি রাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন সমতল ত্রিপুরার জাজিসার নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চক্রবর্তীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন বলে জানিয়েছেন। জগৎ মাণিক্যের আদেশে মুকুন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ওই পুঁথি অনুবাদ করে অধ্যায় প্রতি পঞ্চ মুদ্রা লাভ করেন।

হস্ত জোড় করি বোলে ব্রাহ্মণ মুকুন্দ।

আজ্ঞা পাইলে আমি এথা করি পদবন্ধ।।

তুষ্ট হইয়া দিল রাজা সপুষ্প চন্দন।

বস্ত্র আভরণে বিপ্র করিল অর্চন।।

নৃপতির আদেশ মান্য আরোপিয়া মাথে।

আরম্ভিল পদবন্ধ নৃপতি সাক্ষাতে।।

বিষম সুষম যত ক্রিয়া যোগসার।

শ্রীবিষ্ণু বন্দিয়া রচে উত্তম পয়ার।।

অবশ্য এই জগৎমাণিক্য মূলধারার রাজা নন। মোগলদের বেশি হাতি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাদের সাহায্যে ধর্মমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করে সামান্য সময়ের জন্য রাজা হন, পরে ধর্মমাণিক্য নিজ সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। কখন এই 'ক্রিয়াযোগসার' অনুবাদিত হয়, সে প্রসঙ্গে মুকুন্দ লিখেছেন—

বসু বেদ রস তর্ক শক পরিমাণ।

বৈশাখ মাসের দশ দিন অবসান।।

সোমবারে অমাবস্যা পুণ্য তিথি জানি।

করিল ধর্মের চিন্তা বিপ্রগণ আনি।।

অর্থাৎ জগৎমাণিক্য ১৬৪৮ শকের (১৭২৬ খ্রিস্টাব্দ) ১১ বৈশাখে ব্রাহ্মণদের এই 'ক্রিয়াযোগসার'-এর অনুবাদের আহ্বান করেন। ক্রিয়াযোগসার-এর আরও বহু অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু জগৎমাণিক্যের আদেশে অনূদিত এই পুঁথিই প্রাচীনতম বলে মান্য। বৃহন্নারদীয় পুরাণের মতই এই পুঁথিও ঘরে ঘরে রাখার নির্দেশ ছিল।

সমসের গাজিকে নিয়ে শেখ মনুহরের লেখা 'গাজীনামা' ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না হলেও এতে ত্রিপুরার রাজা ইন্দ্রমাণিক্য ও কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে সমসের গাজির প্রতিদ্বন্দ্বিতার বর্ণনা আছে। সমসের আনুমানিক ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুর আক্রমণের পর তা দখল করে প্রায় তিন বৎসর লক্ষণমাণিক্যের নামে রাজ্যশাসন করেন। সমসের গাজির বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠনের পরিকল্পনা শেখ মনুহর এভাবে দিয়েছেন—

জগতপুর খণ্ডল অবধি মণিপুর।

চৌদ্দগ্রাম বগাসাইর মেহেরকুল পুর।।

নুরনগর লৌহগড় উদয়পুরে গিয়া।

আটজঙ্গাল বিশালগড় সকল লুটিয়া।।

দান্দার বাউরপুর যাব ভুলুয়ানগরী।

উমরাবাদ আহাম্মদাবাদ যতেক নগরী।।

শেখ মনুহরের লেখা এই গাজীনামা নোয়াখালির সেরেস্তাদার মৌলানা দ্ববির ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত করেন। তবে এই মুদ্রিত সংস্করণে মূল গ্রন্থের অনেক অংশই বর্জিত হয়। কবির বহু ভনিতা ও কুলজি পরিত্যক্ত হওয়ায় এই কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে জানা যায় না, তবে এতে কৃষ্ণমাণিক্যের সিংহাসনে আরোহণের উল্লেখ থাকায় মনে হয় কাব্যগ্রন্থটি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত।

'গাজীনামা'য় ঐতিহাসিক বিবরণ থাকলেও তার ঐতিহাসিক মূল্য তুলনায় কম। এতে যেমন সমসের গাজির বাল্য ঘটনা অপ্রাকৃত, তেমনি ইন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে সংঘর্ষের স্থান ও কালের সঠিক বিবরণ নেই।

রাজন্য আনুকূল্যে রচিত পরবর্তী যে কাব্য গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিতি ঘটে, তার নাম 'কৃষ্ণমালা'। এটি কৃষ্ণমাণিক্যের জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত। রচয়িতা পণ্ডিত রামগঙ্গা বিশারদ। তিনি জয়ন্ত চন্তাইয়ের মুখে অবগত হয়ে এই কাব্য রচনা করেন। কাব্যের শুরুতেই তিনি লিখেছেন---

শ্রীশ্রীযুত রাজধর মাণিক্য রাজার
আদেশ করিব কৃষ্ণমালার প্রচার
রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের বিমল বৃত্তান্ত
জয়ন্ত চন্তাই মুখে শুনি আদি অন্ত

কাব্যে রচনাকালের উল্লেখ না থাকলেও ভনিতা থেকে স্পষ্ট যে, রাজধরমাণিক্য জয়ন্ত চন্তাইয়ের মুখে কৃষ্ণমাণিক্যের কাহিনি শুনে রামগঙ্গা নামক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে এই কাব্য রচনার আদেশ দেন। রাজধরমাণিক্য ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাই এই কাব্যের রচনা এই সময়ের মধ্যেই হয়েছিল।

ত্রিপুরার দরবারি ভাষা বাংলা আর কৃষ্ণমাণিক্যের বীরগাঁথা যাতে সকলের বোধগম্য হয়, তাই এই কাব্যের রচনা বাংলা ভাষায়। মধ্যযুগে রচিত রাজমালা ও অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ সকলই সাধারণের জন্য লিখিত। এই কাব্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

সেসব সংবাদ তুমি করিয়া শ্রবণ

প্রাকৃত ভাষায় এক পুস্তক রচন

দেববানী বুঝিবারে নারে সর্বলোক

পয়ার প্রবন্ধে সবে বুঝিবেক সুরে।

শুধুমাত্র কৃষ্ণমাণিক্যের জীবনী এই কাব্যে বিধৃত হলেও এর আকার বিশাল। কৃষ্ণমালার যে আধুনিক প্রতিলিপি পাওয়া গেছে, তাতে নয়টি স্বর্গ বর্তমান। অবশ্য প্রতিলিপিটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। সমসের গাজির তাড়নায় যুবরাজ কৃষ্ণমণির (পরে কৃষ্ণমাণিক্য) উত্তর ত্রিপুরায় কুকিদের কাছে আশ্রয় নেওয়া, সেখানে মোগলদের সঙ্গে সংঘাতের ফলে হেড়ম্ব অর্থাৎ কাছাড় রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া, পরে বিদ্রোহী কুকিদের দমন, হেড়ম্ব রাজার ভুল বোঝাবুঝিতে সংঘর্ষে কৃষ্ণমাণিক্যের জয়, পরে সমসের গাজির মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে রাজত্বের সনদ পাওয়া, রাজ্যের দক্ষিণাংশ পুনরুদ্ধার, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজা হওয়া, ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ এই কৃষ্ণমালায় আছে, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সেই হিসেবে 'কৃষ্ণমালা'-র ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমধিক। প্রকৃতপক্ষে, জয়ন্ত চন্তাই কৃষ্ণমাণিক্যের অনেক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষদর্শী।

কত শুনিয়াছি কত দেখিয়াছি সাক্ষাৎ

সেসব বৃত্তান্ত আমি জানি নরনাথ।

এই সময়েই রাজপরিবারের সম্পর্কিত জয়দেব উজিরের পুত্র দুর্গামণি উজির ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। রামগঙ্গামাণিক্যের আমলে তিনি রাজমালার প্রথম তিন খণ্ডের সংশোধনসহ চতুর্থ খণ্ডটি নতুন করে লিখেন। দুর্গামণি উজিরের কাব্য রচনা কাল রামগঙ্গামাণিক্য থেকে শুরু করে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের আমল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজমালার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড ছাড়াও 'শ্রেণীমালা' নামক রাজপরিবারের একটি কুলজি গ্রন্থও লিখেন। 'শ্রেণীমালা' রচনার সম্ভাব্যকাল ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ।

দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের (১৭৮৫-১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ) সময় থেকেই মণিপুরের

সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় রাজারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন। রাজাদেশে বেশকিছু বৈষ্ণব পদাবলি গ্রন্থের অনুবাদ হয়। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের আমলের বেশকিছু বৈষ্ণব কাব্য ও অনুবাদের পুঁথি পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'গীতচন্দ্রোদয়'। এর রচনাকার রাজকবি নরহরি চক্রবর্তী। এটি বৈষ্ণব পদাবলীর একটি বিশাল সঙ্কলন। বীরচন্দ্রমাণিক্য একে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে প্রথম খণ্ডটি 'অষ্টকাল ও রাজানুরাগ' শিরোনামে ১৮৮৮ সালে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন। এতে রচনাকারের ভনিতা নিম্নরূপ—

এসব শুনিয়া চিত্তে পাইবে সন্তোষ।
মুই মহামূর্খ মোর না লইবে দোষ।।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম শিরে ধরি।
গৌর কৃষ্ণ রাইরূপ গায় নরহরি।।

এই সময়ের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অনুবাদ পুঁথিটি হচ্ছে 'গীতকল্পতরু'। এর পুষ্পিকায় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাজাদেশে এর প্রতিলিপি তৈরি করা হয় বলে সংস্কৃতে বলা হয়েছে। এই বিরাট সঙ্কলনের সঙ্কলকের কোনও নাম পাওয়া যায়নি। এতে দরবারের চিত্রকর আলম কারিগরের চিত্র দেখা যায়।

ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের আদেশে নন্দকিশোর দাস 'বৃন্দাবন লীলামৃত' সঙ্কলন করেন। এর ভনিতা—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্মে করি আস।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।।

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের (১৮৬২-১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ) আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের জগতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হয়। আগে আমরা রাজন্য আনুকূল্যে ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যের চর্চার উদাহরণ দেখেছি, কিন্তু অসম্ভব প্রতিভাবান বীরচন্দ্রমাণিক্যের ক্ষেত্রে তাঁকে নিজেই সাহিত্য ও শিল্পকলার চর্চায় জড়িয়ে থাকতে দেখি। বীরচন্দ্রমাণিক্য যেমন একজন সুকবি ছিলেন, তেমনি তিনি একই সঙ্গে সংগীত বিশারদ ও চিত্রকরও ছিলেন। তাঁর সভায় ভারতের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ এবং যন্ত্রীর সমাবেশ ঘটেছিল। বিখ্যাত

রুদ্রবীণা ও রবাব বাদক কাশেম আলী খাঁ, সেতার ও সুরবীণ বাদক নিসার হুসেন, এস্রাজ বাদক হায়দর খাঁ, সেতারবাদক নবীনচন্দ্র গোস্বামী, বেহালা বাদক হরিদাস, পাখোয়াজ বাদক কেশব মিত্র, পঞ্চানন মিত্র এবং রাজকুমার বসাক, ধ্রুপদী সংগীত শিল্পী ক্ষেত্রমোহন বসু, কীর্তন শিল্পী প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন মিত্র, জলতরঙ্গ শিল্পী শরৎ বাইন তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। এছাড়াও তাঁর সভায় উপস্থিত থাকতেন খেয়াল ও টপ্পাগায়ক ভোলানাথ চক্রবর্তী, বেহালাবাদক হরিশচন্দ্র, ঢাকার বিখ্যাত সাধু তবলচি, খেয়াল গায়ক মিঠ্ঠু খাঁ ও তমদ্দক হোসেন, টপ্পা গায়ক হুসনু খাঁ, সরোদিয়া আহম্মদ খাঁ এবং কাশ্মীর থেকে আগত কত্থক শিল্পী কুলন্দর বক্স। এই কুলন্দর বক্সের নৃত্য মহারাজ তন্ময় হয়ে দেখতেন। বাংলার বিখ্যাত গায়ক যদুভট্টও বীরচন্দ্রমাণিক্যের দরবারে হাজির হয়ে গান পরিবেশন করে মুগ্ধ মহারাজের কাছ থেকে 'তানরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। এইসব বহু গুণীজনের রাজসভায় উপস্থিতিই কেবলমাত্র সংগীতের জগতে বীরচন্দ্রমাণিক্যকে অমর করে রাখত।

কিন্তু সাহিত্য-জগতেও তাঁর অনায়াস গতি ছিল। এ প্রসঙ্গে কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন—'মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি একজন সুকবি। তৎপ্রণীত দুইখানা কবিতা পুস্তক আমরা দর্শন করিয়াছি। উভয় গ্রন্থই গীতিকাব্য। তাঁহার গীতির অনেকগুলি 'বর্জ্জি' বুলিতে রচিত, সেগুলি বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অনুকরণে লিখিত। অনুকরণ হইলেও ভাব সরল মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার সমস্ত গীতি কবিতাই প্রেমের কাকলীপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের ছায়াপাতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল সুন্দর কবিতা কুসুমের সৌরভ আগরতলার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কদাচিত কাহাকেও আকুলিত করিয়া থাকে। সেগুলি প্রকাশ করিতে মহারাজ নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রকাশিত হইলে তিনি বঙ্গীয় কবি সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই।'

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের ছয়খানা কবিতার বই পাওয়া গেছে। এরমধ্যে 'হোরি' ও 'ঝুলন' এই দুইখানা গানের বই। বাকি চারখানা বই 'প্রেম মরীচিকা', 'উচ্ছ্বাস', 'অকালকুসুম' ও 'সোহাগ' বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা।

'ঝুলন' কাব্য গ্রন্থখানা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী দেবীর মৃত্যুর অল্পদিন পরে লেখা। তাই এই গ্রন্থে ঝুলনগীতির সঙ্গে মৃত পত্নীর

প্রতি স্মরণ কবিতাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি এতে লিখেছেন—

দেবি! তুমি ত স্বরগ পুরে
জানি নাকো কত দূরে
কোন অন্তরাল দেশে
করিতেছ বাস।
পশিতে কি পারে তথা
মানবের আশালতা
বিরহের অশ্রুজল
প্রাণভরা ভালবাসা।
হেথা আমি আছি পড়ে
হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে
গুণিতেছি সারাদিন
জীবনের বেলা।
যেন রে উপল দেশে
সাথীহিন একা বসে
জানি না ফুরাবে কবে
এ মরতের খেলা।

এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে মহিমচন্দ্র ঠাকুর লিখেছেন—'ঝুলন' নামক ক্ষুদ্র গীতি-কাব্যখানি ব্রজের ভাবে ও ব্রজবুলিতে সংগীত শাস্ত্রজ্ঞ বীরচন্দ্রের লিখিত। আর বীরচন্দ্রের মত সুকণ্ঠে গীত হইত। বীরচন্দ্র আত্মহারা হইতেন এবং ভাবে গদগদ হইয়া তিনি ভাবস্রোতে ভাসমান হইতেন'। বর্ষাকালে অভিসারের এক চমৎকার বর্ণনা কবির লেখনিতে ফুটে উঠেছে—

বরষা সময়ে চাঁদনী রাতি,

ঘন আবরণে মলিনা ভাতি।
নবজলধর হরষে বরষে,
মত্ত দাদুর ডাকয়ে হরষে।
তমাল ডালে শিখীকুল নাচে,
রমণী হৃদয় রমণ যাচে।
গরজে বারিদ চমকে চপলা,
থর থর কম্পে নবীনা বালা।
নাগরী সঙ্গে নাগর ঝুলে,
ঈষত ঈষত নূপুর বোলে।
এ হেন সময়ে বীরচন্দ্র দাস
যুগল মিলন নিরখিত আশ।

বীরচন্দ্রমাণিক্য রচনায় এতটাই ভাবে গদগদ থাকতেন যেন তাঁর চোখের সামনেই এই ঝুলন লীলা সম্পন্ন হচ্ছে, এই লীলায় যেন তিনিও অংশ গ্রহণ করছেন---

থামাইয়া দোলা রাধাশ্যাম দুহুঁ
শ্রমজলে ভাসি যায়,
শ্রীরতি মঞ্জরী শ্রান্তি দূর করে
মৃদুল চামর বায়।
ললিতাদি সখী নিছি নামাইল
কুসুম আসনে রাই,
রাই বামে করি বসিল নাগর
সুখের অবধি নাই।
শ্রীরূপ মঞ্জরী সেবায় মগন

যে যেমন ভাল জানে

কেহুঁ আনে জল বাসিত শীতল

উপহার কেঁহু আনে।

কর্পূর বাসিত সুরস তাম্বুল

বিশাখা দিল যে মুখে

সখীর ইঙ্গিতে দাস বীরচন্দ্র

পদসেবা করে সুখে।

'হোরি' গীতিকাব্যটি দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত, এতে চৌত্রিশটি হোলির গান আছে। মহিম চন্দ্র ঠাকুর লিখেছেন---'রাজপুতনার যেমন ফাগ উৎসব—ত্রিপুরায় তেমন হোরি। রাজা হইতে প্রজাবৃন্দ এ উৎসবে সকলে মাতোয়ারা ; ... কে ছোট কে বড়-আনন্দ-আনন্দ,-হোরি-ফাগুয়া! —হরষ-পরশে সব একাকার!! সেদিনের সেই মাতোয়ারা ভাব স্মরণে আসিলে আগে মনে পড়ে ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্রের কথাবার্তা।—মনে পড়ে তাঁহার গান—'। এই হোলির গানগুলি অনেকটা ব্রজবুলিতে লেখা—

রসে ডগমগ ধনী আধ আধ হেরি,

আঁচল সঞে ফাগ লেই কুঁয়রি।

হাসি হাসি রসবতী মদন তরঙ্গে

দেয়ল আবির রসময় অঙ্গে।

চতুর নাহ হৃদয়ে ধরু প্যারী

মুচকি মুচকি হাসি হেরত গোরী।

দেয়ত ফাগু নাহ লোচন-যোড়,

মুদল ধনী দুহুঁ নয়ন চকোর।

ইহ অবসরে কত চুম্বই কান,

বীরচন্দ্র রচ দুহুঁ রস গান।।

প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতীর মৃত্যুর পর বীরচন্দ্রমাণিক্যের মর্মবেদনা 'প্রেম মরীচিকা' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে---

আজি ভালবাসা যেন সাথীহারা পাখী
কাঁদিছে বাজিছে একেলাটী।
র'য়ে র'য়ে এখনো কি উঠিস্‌রে ডেকে---
সাড়া দিবে কেবা আর আছে?
যা ছিল সকলি গেছে এবে একা আমি
কেনরে আসিস্‌ মোর কাছে?

এরপরে বীরচন্দ্রমাণিক্য মনোমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। এই মনোমোহিনী দেবীকে উদ্দেশ্য করে রাজা তিনটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থটির নাম 'উচ্ছ্বাস'। এই নামেই এই গ্রন্থের কবিতার প্রকৃতি বোঝা যায়। ভানুমতী দেবীর মৃত্যুর শোকের পর মনোমোহিনী দেবীর সান্নিধ্যে অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের সুখ, এই এক মিশ্র অনুভূতির প্রকাশ এই কাব্যে ঘটেছে---

সুখে দুখ গিয়াছে ডুবিয়া,
দুঃখের হৃদয়ে আজি, নেশার আধেক ঘোরে,
রহিয়াছে কি সুখ ছাইয়া!
নয়নে ভাসিছে কত সুখের স্বপন,
পাইয়া তোমার সেই সুখ সম্মিলন!

'অকালকুসুম' কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় যে, মহারাজ বীরচন্দ্র ভানুমতী দেবীর শোক অনেকটাই সামলে নিয়েছেন। মনোমোহিনী দেবীর প্রতি তাঁর নববিকশিত কুসুমমালা এই কাব্যে নিবেদন করেছেন---

গেঁথেছি তোমার লাগি বিরলে বসিয়া আমি
যে সাধের মালা

উজ্জ্বল মানিক নহে—  নহে যুঁই—নহে বেলি

রূপে গন্ধে নাহি করে আলা।

পর মুহূর্তেই তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন, এরপর তিনি লিখেছেন—

ভালমন্দ নাহি জানি,  গাঁথিয়া পেয়েছি সুখ

রূপে গুণে তোমারি মতন,

তাই এত করেছি যতন।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের 'সোহাগ' কাব্যগ্রন্থখানাও মনোমোহিনী দেবীকে উদ্দেশ্য করে রচিত। কবি নবীন প্রেমেরই গুণগ্রাহী, তা বুঝাতে লিখেছেন—

মানবের নব প্রথম পিরীতি

তরুণ নূতন কুসুম মত,

চিরকাল মনে রহে জাগরিত,

পরের পিরীতি রহে না তত।

সেই সুধাময় নবীন পিরীতি

জনম নবীন যৌবন সনে;

তাই চিরদিন পিরীতি মুরতি

দেবতার মতো জাগয়ে মনে।

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত লিখেছেন—'ভুক্তভোগী ভাবুক কবির উদ্ধৃত কবিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, নূতন রাজমহিষীর প্রযত্নে তাঁহার হৃদয়ের ক্ষত প্রলেপ লিপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা যৌবন লব্ধ নবীন প্রেমের প্রথমচ্ছটা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আরাধ্য দেবতার ন্যায় সেই পবিত্র প্রেম-স্মৃতি সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক ছিল।'

এছাড়াও বীরচন্দ্রের আরও কিছু গ্রন্থ ও অনেক কবিতা ছিল, যা বর্তমানে পাওয়া যায় না। তবে তাঁর গানগুলি লোকসমাজে কবিতার মতো অপরিচিত ছিল না। মহারাজ সেগুলি নিজে পড়ে বা গেয়েই তৃপ্ত থাকতেন না, সুগায়কদের দিয়ে সেগুলি কীর্তনে বা মজলিসে গাওয়াতেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব মহারাজের

এই গানগুলি বৈষ্ণব জনোচিত এবং ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। একটি গীতে শ্রীকৃষ্ণের রূপের যে মনোহর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা নিচে দেখানো গেল—

জয়জয়ন্তী—ঝাপ

নীল নব জলদ-রুচি রুচি রুচির সুন্দর,
পীত-ধটি কটি তটে সুসাজে।
মুকুট পরি খচিত শিখি পুচ্ছে নব-মল্লিকা
বক্ষে বনমালা বিরাজে।।
অধর'পর বেণু তঁহি মিলিত মুখ মোদনে
মধু মধু মধুর মোহ তানে।
শুনহি পশু পাখীকুল শাখীকুল পুলকিত,
তপন তনয়া বহ উজানে।।
শ্রবণযোগে মণি-মকর গণ্ডে করু ঝলমল,
মেহ'পর বিজরী যনু হাসে।
সহজে দৃক্-অঞ্চল জিনিয়া সরসীরুহ
তাহে কত কুসুম-শর ভাসে।।
কেলী কদমকি তলে সুললিত ত্রিভঙ্গিয়া,
নব-অরুণ চরণ-অরবিন্দ।
গোকুল কুল রমণীক মনসিজ সুমূর্ত্তিময়,
পেখব কি ললিত অতি মন্দ।।

পদাবলীর শেষ লাইনের 'ললিত' প্রকৃতপক্ষে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য, তাঁর আরেক নাম ছিল 'ললিতচন্দ্র'।

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত তাঁর 'পঞ্চমাণিক্য' গ্রন্থে এই গীতটি ছাড়াও রাধিকার রূপ বর্ণনায় আরেকটি গীত পরিবেশন করেছেন। এই দুটি গীত সম্পর্কে তিনি

লিখেছেন—'এই দুইটি পদ যে কোন উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদামৃতের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভাবমাধুর্য্যের ও শব্দসম্পদে পদ দুইটি অতুলনীয় হইয়াছে। যিনি একবার মাত্র আগরতলার কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, সুগায়ক কর্তৃক গীত হইলে, এই গান দুইটি ভক্ত হৃদয়ের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।'

এই ধরনের আরও অনেক বৈষ্ণব পদাবলী মহারাজ বীরচন্দ্র দ্বারা রচিত হয়েছিল, কিন্তু তার একটা ভগ্নাংশ মাত্র উদ্ধার করা গেছে।

এছাড়া তিনি একজন কুশলী ফোটোগ্রাফার ও চিত্রশিল্পী ছিলেন। নিজ অধ্যবসায়ে তিনি ভারতের এক আধুনিক ফোটোগ্রাফার হয়ে উঠেন। তৎকালীন সময়ে পাশ্চাত্যের আধুনিকতম ফোটোগ্রাফিক বিবর্তন সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন এবং যথাসাধ্য তার প্রয়োগও করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'-র জার্নালে (সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯) তাঁর সচিত্র জীবনী বের হয়, যাতে এ বিষয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। চিত্রশিল্পী হিসেবেও তিনি অসাধারণ ছিলেন এবং তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন—'তেমনিই চিত্রকলায় তাঁহার প্রকৃতিনিষ্ঠ শক্তির প্রকাশ—দেখা যাইত। বাল্যকাল হইতে সুপদ্ধতিতে শিক্ষা না পাইলেও প্রকৃতির জোগানে তাঁহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইত। তিনি realistic পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন।—ইং সালে তাঁহার সহিত দেখায় তিনি আমার সঙ্গে আর্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। Art যে immitation নয় illusion-ই সে কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেকবার বলিতেছিলেন। আমি তাঁহার চিত্রের কথা বলিতে গেলে ব্যবহার ক্ষুব্ধ খুল্লতাত বাধা দিয়া বলিতেন, বাস্তবিক তাঁহার চিত্র artistic নয়।' তাঁর প্রতিভার টানে সুদূর ফ্রান্স দেশ থেকে একজন Apollonius নামে চিত্রশিল্পী এসেছিলেন সভাসদ হয়ে।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব তাঁর প্রতিভার ছটায় সাহিত্য ও শিল্পকলার সাধনা নয়, এ সকল বিষয়ে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের সাহিত্য ও শিল্পকলা সাধনায় উন্মুখ করে তোলা। 'আবর্জনার ঝুড়ি' গ্রন্থে নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন যে, তাঁরা যখন পড়াশোনা করতেন, তখন তাঁদের কবিতা লেখার অভ্যাস করতে হত। উপরন্তু, তাঁদের সাহিত্য ও কলাচর্চার সভায় বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকতে হত। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

লিখেছেন---'সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে মহারাজের বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহাদিগকে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্র, শিল্প, সংগীত এবং কবিতা রচনা শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। এই সকল কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে মহারাজ কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। কুমারগণের সাহিত্য-চর্চার নিমিত্ত একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহাদের রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা এই সভায় পঠিত ও আলোচিত হইত।'

তিনি অন্তঃপুরের রাজকুমারীদেরও একইভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এইভাবে তিনি রাজপরিবারে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিলেন, তা রাজন্য আমলের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের সময়েই রবীন্দ্রনাথের প্রথম যোগাযোগ ঘটে। ভানুমতী দেবীর মৃত্যু হলে বীরচন্দ্রমাণিক্য যখন বিরহে ব্যাকুল; তখনই তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য গ্রন্থটি আসে। জহুরীর চোখ দিয়ে ওই সময়ের অখ্যাত এই কবির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ মানসচক্ষে দেখে কবিকে সম্মানিত করার জন্য একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দেন। এই অপ্রত্যাশিত সম্মানের কথা কবি বারবার বলেছেন। 'জীবনস্মৃতি'-তে কবি লিখেছেন---'কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি, জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন'। শেষবারের মত আগরতলায় এসে কিশোর সাহিত্য সমাজে তিনি একই কথার পুনরুক্তি করে এই কথাগুলি আরও যোগ করেন---'জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা করেছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তাকেও দেখতে পান বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।' বীরচন্দ্রমাণিক্য সম্পর্কে কবির এই মূল্যায়ন যথার্থ।

মুর্শিদাবাদের প্রখ্যাত পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'শ্রীমদভাগবত' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদের খবর পেয়ে বীরচন্দ্র ৫০০ টাকা

পাঠিয়ে পুরস্কৃত করেন ও তাঁকে রাজ দরবারে যোগ দিতে আহ্বান করেন। বিদ্যারত্ন তাতে সাড়া দেন এবং বীরচন্দ্র তাঁকে দিয়ে 'শ্রীমদভাগবত'-এর অনুবাদ এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছেপে ভক্তদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এছাড়াও মহারাজের অর্থানুকূল্যে পণ্ডিত রামনারায়ণ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এদের মধ্যে নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তি রত্নাকর', লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথ বল্লভ' এবং কবি কর্ণপুর রচিত 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' উল্লেখযোগ্য। দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' বীরচন্দ্রমাণিক্যের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি বইটি মহারাজার নামে উৎসর্গ করেন।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের (১৮৯৬-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) পিতার মত সংগীত কলা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকলেও সাহিত্য ও কৃষ্টিতে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। 'বার্ষিক' পত্রিকায় তাঁর কিশোর বয়সের অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগের ফলে রাজকার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ শৈথিল্যও তাঁর পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মন্ত্রী রমনী মোহন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে—'এখানে আবহমান কাল রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষত আমি বঙ্গ ভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালোবাসি এবং রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি। ইংরেজি শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।'

রাধাকিশোরমাণিক্যের আমল থেকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'ধূমকেতু' ও 'বঙ্গভাষা' নামের দুটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন মহারাজকুমার মহেন্দ্র দেববর্মণ ও সুরেন্দ্র মোহন দেববর্মণ। 'বঙ্গভাষা' পত্রিকাটি দীনেশচন্দ্র সেন, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, অক্ষয় মৈত্রেয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল। এছাড়া ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের সম্পাদনায় 'অরুণ' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও আত্মপ্রকাশ

করেছিল, যাতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে বহু লেখা বেরিয়েছিল। এই 'বঙ্গভাষা' ও 'অরুণ' সাহিত্যপত্র প্রকাশে রাধাকিশোরমাণিক্যের উৎসাহ ও অনুদান ছিল। তাঁরই উৎসাহে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ 'রাজমালা' প্রকাশের দায়িত্ব নেন। তিনি ত্রিপুরার পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস পুনরুদ্ধারে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদকে নির্দেশ দিলে তার ফলশ্রুতি হিসেবে বিদ্যাবিনোদের 'শিলালিপি সংগ্রহ' গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়। এছাড়া গোবিন্দমাণিক্যের আমলে অনুবাদিত 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ'-ও চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়। বাংলা সাহিত্যের সাধক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র সেন মহারাজের আনুকূল্যেই ত্রিপুরার রাজদরবার থেকে আজীবন বৃত্তি পেয়েছেন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার বাইরেও রাধাকিশোর মাণিক্যের অবদান আছে। বিপদে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে পঞ্চাশ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বার্ষিক অর্থ অনুদান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংগীত প্রবেশিকা' প্রকাশে তাঁর অর্থ সাহায্য, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে যন্ত্রপাতি দান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।

রাধাকিশোরমাণিক্য কতকগুলি হোলি ও কীর্তনের গান রচনা করেছেন। তাদের সাহিত্য মূল্য কম নয়। তাঁর রচিত একটি কীর্তনের কয়েকটি লাইন—

আভরণ নিরুপম স্থির সৌদামিণী সম,
কটিতটে পীতধটি সাজে,
চরণ বিমল কিবা, তরুণ অরুণ বিভা,
মাণিক মঞ্জীর তাহে সাজে,
নবীন কিশোর শ্যাম ললিত ত্রিভংগ ঠাম,
জনমন মোহন বিলাস,
কালিয়ারূপ উপমা, কালিয়া রূপেতে সীমা
ভন বৃন্দাবনচন্দ্র দাস।

বাংলা ভাষায় রাধাকিশোরমাণিক্য কৈশোর বয়স থেকে বিশেষ দক্ষ ছিলেন,

তাঁর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ সনে প্রকাশিত 'বার্ষিক' পত্রিকায় 'নববর্ষ' প্রবন্ধে দেখা যায়---'একখণ্ড মেঘ দূরে দেখা যাইতেছিল, দেখিতে দেখিতে সঞ্চিত, পুষ্ট ও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল; বিদ্যুদ্দাম ঘনঘটার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল; শিবের তাণ্ডব লজ্জিত করিয়া, পবন, জটার ন্যায় মেঘমালা বিকীর্ণ করিয়া নাচিতে লাগিল;---সোঁ সোঁ শব্দে ফণীর গর্জ্জন;---মেঘ গর্জ্জনে অট্টহাস; ---প্রলয় যেন উপস্থিত, ইহার কিছুক্ষণ পরে সমুদয় পরিবর্তিত হইয়া গেল, সন্ধ্যার সুবর্ণ কান্তিতে মেঘমালাও স্বর্ণ পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া হাসিতে লাগিল।' একজন ষোল বছরের কিশোরের পক্ষে বাংলা ভাষায় এই ধরনের পরিপক্কতা প্রশংসনীয়।

একই প্রবন্ধে তিনি কিছু অংশ কবিতায় প্রকাশ করেছেন, যাতে তাঁর সমান পারদর্শিতার উদাহরণ মেলে---

উঠাইয়া চন্দ্রবান সুনীল আকাশে,
ত্রিপুর-ভবনে সবে করিল প্রবেশ;
ছাড়িলেন মহারানী সমরের বেশ।
কষিত-কাঞ্চন-কান্তি মূরতি মোহন,
আকুল তরঙ্গ হতে কমলা যেমন।

পরবর্তী সময়ে আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'ত্রিপুরা' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে রাধাকিশোরমাণিক্যের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, যাতে সুনিপুণ শব্দচয়ন ও সুগঠিত ছন্দ মাধুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধাকিশোরমাণিক্যের রচনাগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে গ্রথিত না হওয়ায় বেশিরভাগই বিলুপ্ত। কবিতাটি নিম্নরূপ---

অরুণ পঙ্কজ, জিনি পদাম্বুজ, অগুরু চন্দন মাখা।
কনক নূপুর, অতি মনোহর, তাহে মণিময় রেখা।।
যুগল চরণ, অতি সুগঠন, ঈষত ইঙ্গিতে বাঁকা।
ত্রিভঙ্গিমা ছাঁদে, পীতধরা বেঁধে, ধরেছে কদম্ব শাখা।।
শ্রীমুখমণ্ডল, অতি নিরমল, আধ পীতাম্বরে ঢাকা।

কটিতে কিঙ্কিনী, জিনি সৌদামিনী, জ্বলিছে অনল শিখা।।

গোপীজন মন, করিছে হরণ, ফিরাইয়ে বঙ্কিম আঁখ।

বনমালা গলে, তিলক কপালে, চূড়াতে ময়ূর পাখ।।

আরো তদোপরি, বিচিত্র যে হেরি, শ্রীরাধে জয়রাধে লেখা।

ভাবেরে অবোধ, বৃন্দাবনচন্দ্র, অন্তে পাবে ব'লে দেখা।।

রাধাকিশোরমাণিক্য রচিত এই বৈষ্ণব পদটি সম্ভবত গান হিসেবেই ব্যবহৃত হত। ভনিতার কবির নাম 'বৃন্দাবনচন্দ্র' বলা হয়েছে। রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ বিকচ চৌধুরী জানিয়েছেন, রাধাকিশোরমাণিক্যের কোষ্ঠীপ্রদত্ত নাম ছিল বৃন্দাবনচন্দ্র।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের কবি-প্রতিভার সাক্ষাৎ উত্তরসূরী ছিলেন তাঁর কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবী। প্রচারের আলোকহীন ত্রিপুরার মধ্যেই তাঁর কবিতা সীমাবদ্ধ থাকায় বাইরের বৃহত্তর আঙ্গিনায় তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়েনি।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটির নাম কণিকা (প্রকাশকাল ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ)। এই গ্রন্থটি তিনি পিতা স্বর্গত বীরচন্দ্রমাণিক্যকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ মালিকায় তিনি লিখেছেন—

এ নহে কবির গাথা কবিতা কুসুম মালা
সুবাসিত চির-মধুময়
এ কেবল শুষ্ক ফুল, বিহীন সুবাস মধু
মলিন বিলীন দলচয়।
তব পদ পূজাযোগ্য নহে এই শুষ্ক ফুল
তবু পিতা জানি আমি মনে,
নীরস কবিতা মম হইবে সরস অতি
শুধু তব স্নেহের নয়নে।

... ... ...

... ... ...

তবু পিত উৎসর্গিনু স্বর্গীয় চরণে তব,

অতি ক্ষুদ্র মম উপহার,

অশ্রুজল বিন্দুসহ ভকতি প্রণাম এই

লহ পিতা দীন তনয়ার।

কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিছু কবিতার সমষ্টি। এর মধ্যে 'নিশীথ সঙ্গীত' শীর্ষক কবিতায় প্রাঞ্জল ভাষায় নির্জন নিশীথের সুললিত বর্ণনার কিছু লাইন দেওয়া গেল---

গভীর হেমন্ত নিশি জোছনা প্লাবিত দিশি,

প্রকৃতি নিদ্রায় নিমগন,

চাঁদের অমিয় মাখা নীহারের জলে ঢাকা

তরুলতা বন উপবন।

আরেকটি কবিতায় বর্ষার বর্ণনা অতি বাস্তব ও সহজ সুন্দর---

ঢালি মেঘ বারি রাশি রহিয়া রহিয়া,

স্নিগ্ধ করে চাতকীর পিপাসিত হিয়া;

বায়স ভিজিছে বসি-পাতার আড়ালে,

বাদলের তীব্র বায়ু বহে উতরোলে

সবুজ শ্যামল ক্ষেতে ভিজিছে কিষাণ,

নিড়াইছে ক্ষেত্রচয় গেয়ে গ্রাম্য গান;

... ... ...

... ... ...

আর্দ্র বসনেতে ঢাকি সুকোমল কায়,

এলো চুলে গ্রাম্য বধূ জল নিয়ে যায়;

একবার হাসি মেঘ ক্ষণেকের তরে,

সবেগে ঢালিছে পুন খরতর ধারে;

এরপরই এক দারুণ দুর্ঘটনায় কবির জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ১৩১২ সনে তাঁর বৈধব্য ঘটে। দুঃখের অতল সাগরে নিমজ্জমান এই কবি এ সময়ে যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তার নাম 'শোকগাথা'। অধ্যাপক মোহিত পুরকায়স্থ লিখেছেন—"এ বিষয়ে 'প্রিয়প্রসঙ্গ' রচয়িত্রী মানকুমারী বসুর সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। শুধু 'প্রিয়প্রসঙ্গ' গদ্যে লেখা, আর 'শোকগাথা' কবিতার বই।"

এর প্রকাশকাল ১৩১৩ সন। 'কণিকা'-এর চেয়ে 'শোকগাথা'র কবিতাগুলি অনেক পরিণত, কিন্তু একটি বিষয় নিয়ে লিখিত হওয়ায় তাতে একঘেয়েমি আসে। কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। 'নিবেদন' অংশে তিনি লিখেছেন—'শোকগাথা' আমার জীবনের ঘোর বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ণ হৃদয়ের নিদর্শনমাত্র। সুতরাং, ইহাতে কাহারও মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া আশা করি না।'

গ্রন্থটি তিনি স্বর্গত প্রিয় স্বামীকে উপহার দিয়েছেন। তার সামান্য কয়েকটি লাইন—

স্বামিন,

গিয়েছ স্বরগ পুরে!

কোথা সে গো কত দূরে,

অজানা সে কোন্ দেশে করিতেছ বাস?

পশিতে পারে কি তথা,

বিষাদ বিরহ গাথা

বেদনার অশ্রুজল দুখের নিশাস?

জীবনের ওপারে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছায় কবির মৃত্যু কামনা—

কবে আমি যাব সেই দেশে,—

মৃত্যু বিনা সে পথের

সাথী নাহি মানবের,
এস মৃত্যু চির সুপ্তি বেশে;
যদিও করাল তুমি তবু মম প্রিয়,
পরশি মোহিয়ে মোরে সাথে করি নিয়ো।

অনঙ্গমোহিনী দেবীর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'প্রীতি' (প্রকাশকাল ১৩১৭ সন)। এটি কবির কাব্য-প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ। এ কাব্যগ্রন্থে অনেকটাই আত্মস্থ, সংযত। তাই তাঁর কবিতাগুলিও সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ। 'পেয়েছি' কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন---

তোমারে আমি রেখেছি বুকে
সুখের তরে নয়;
তোমারে আমি পেয়েছি বুকে
দুখেরে করি জয়।
আকাশ ছেয়ে তোমার প্রীতি
বাতাস সম আসে;
শীতলি' মম চিত্ত নিতি
বিচরে প্রাণ বাসে।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের মতই তাঁর ব্রজবুলিতে দখল ছিল---

মেঘ বরখে ঘন,
গুরুগুরু গরজন,
তিতলহ তরুলতা কুঞ্জ;
চমকি বিজুরি মরি
কানন গহন ভরি,
ছাওল হিয়া তম-পুঞ্জ

বীরচন্দ্রমাণিক্যের আরেক কন্যা গিরীন্দ্রবালা দেবী অনেক কবিতা লিখলেও তাঁর কোনও সংকলন গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর একটি কবিতার চার লাইন—

অসার সংসার পানে আর না চাব,
অসীমে অসীম আমি মিশায়ে যাব,
ডুবিব জন্মের মত ভাব সাগরে
শুধু তোমারই তরে। (তোমারই তরে)

বীরচন্দ্রমাণিক্যের কনিষ্ঠা কন্যা মৃণালিনী দেবীর 'স্মৃতি' নামক কাব্য-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আরও অসংখ্য কবিতাও তিনি লিখেছেন, যা প্রকাশিত হয়নি। 'বর্ষা' কবিতার চার লাইন নিচে দেওয়া গেল, যা তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক—

চমকে দামিনী ঘন আঁধার আকাশে,
এ বিরহ তপ্ত হৃদি অন্বেষিতে কার।
ঝরিতেছে বারিধারা অবিরল ধারে,
শুধু মনে পড়ে আজ অশ্রুজল তার।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। ইনি ইংরেজি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায়ও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। পিতার মতোই তিনি একজন প্রখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল। ত্রিপুরা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে নিয়ে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'ত্রিপুরার স্মৃতি' ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর আগের বছর 'ভারতীয় স্মৃতি' নিয়ে তাঁর লেখা একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশ (যেগুলি তিনি ভ্রমণ করেছিলেন) নিয়ে আলোকচিত্র সহ বর্ণনা আছে। তাঁর লেখা 'বাহাদুর শাহ্ আবু জাফর' (প্রকাশকাল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে মোগল সম্রাটের মূল উর্দু কবিতা ও তার বঙ্গানুবাদ আছে। এছাড়া তিনি আরও তিনটি গ্রন্থ লিখেন। সেগুলি হল 'জেবুন্নিসা বেগম' (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ), 'আগ্রার চিঠি' (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'ওয়াকয়্যাতে ত্রিপুরা' (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ)।

রাধাকিশোরমাণিক্যের পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যেরও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গভীর অনুরাগ ছিল। চিত্রশিল্পে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত ছিল। তাঁর আঁকা সন্ন্যাসী, ঝুলন ইত্যাদি তৈলচিত্র প্রশংসার যোগ্য। একসময়ে দরবার কক্ষে তাঁর তৈলচিত্র শোভিত হত। এছাড়া সেতার, এস্রাজ, বাঁশি প্রভৃতি যন্ত্রসংগীতে তিনি অসামান্য দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। গ্রামাফোন রেকর্ডে তাঁর সেতার ও বাঁশির বাদন থাকলেও তা তিনি ব্যবসায়িক লক্ষ্যে প্রচারের অনুমতি দেননি।

নাটকে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। রবীন্দ্র নাট্য 'বিসর্জন'-এর তিনিই সর্বপ্রথম স্বউদ্যোগে ত্রিপুরায় মঞ্চস্থ করান। তিনি 'দোললীলা' নামে এক নৃত্যনাট্য রচনা করে তাতে মণিপুরী নৃত্য যোগ করে শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করান। 'পুষ্পবন্ত নাট্য সমাজ' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। বলা যেতে পারে, তিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার, সুরকার, শিল্পী ও পরিচালক।

সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। বৈষ্ণব সাহিত্যে অনুরাগী বীরেন্দ্রকিশোরের ঘনশ্যাম দাসের রচিত 'গীতচন্দ্রোদয়' প্রকাশনার উদ্যোগ এর পরিচয় দেয়। তাঁরই উদ্যোগে কালীপ্রসন্ন সেনের সম্পাদনায় রাজমালার পুনঃসম্পাদনার কাজ শুরু হয়।

তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকুমারদ্বয় নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ও রাজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগীদের উদ্যোগে আগরতলায় 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' গড়ে উঠে।

ঐতিহ্যের ধারা বহন করে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যও কিছু গান রচনা করেন। তার মধ্যে একটি—

সুন্দরী সজনী রাস বিহারিনী, সুন্দর নাচনী বেণী ভুজঙ্গিনী
শ্যাম মনচোরা, কুচযুগপর হার সুন্দর দোলনী,
মধুময় হাসিনী, রসময় বয়ানি, গজমোতি কাঞ্চন ভূষিছে অঙ্গে
সুন্দরী সজনী রাধাকিশোরী।
ত্রিপুরা নরপতি সূত বীরেন্দ্র দাস ভনতরূপ
শ্যাম মনমোহিনী, নবমণি কিরণ ফুসিল অঙ্গো।।

বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের পুত্র মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যও সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতির অনুরাগী ছিলেন। গ্রামাফোন কোম্পানি তাঁর বাজনা রেকর্ড করলেও অনুমতির অভাবে তার বাণিজ্যিক প্রচার সম্ভব হয়নি।

নাটকেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। ১৯৩৪ সালে তাঁর রচিত নাটক 'শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস' কলিকাতার ত্রিপুরা হাউসে মঞ্চস্থ হয় এবং গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক নাটক 'জয়াবতী' আগরতলায় মঞ্চস্থ হয়।

সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর রাজসভায় বহু সংগীত শিল্পীর সমাবেশ ছিল। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ইনায়েৎ খাঁ, মাজাফর খাঁ, মাজিদ খাঁ প্রভৃতির মত খ্যাতনামা শিল্পীরা মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন।

ঐতিহ্য অনুসারে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং অন্যান্যদের মতোই এই বিষয়ক কিছু গানও রচনা করেছেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে হোলির গান নিয়ে 'হোলী' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অবশ্য গ্রন্থে লেখকের নাম না থাকলেও এটি যে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যেরই রচিত তা মহারাজের ব্যক্তিগত সচিব দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের জবানীতে স্পষ্ট হয়। তিনি লিখেছেন—'হোলী' গ্রন্থটি বাহির হইল ১৯৪১ সালে। লেখক ছদ্মনামে লিখিত হইয়া ফাগুয়া সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত হইল। আগের বছর হইতেই মহারাজ বীরবিক্রম এই বইয়ের জন্য ডায়েরিতে গান লিখিয়া রাখিতেছেন। কখনও এগুলির স্বরলিপি রচনায় প্রবৃত্ত, কোথাও দেখিতে পাই গ্রন্থের অবতরণিকার জন্য 'হোলী ও নবরস' এবং 'হিন্দু সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' প্রবন্ধের বিচ্ছিন্ন রচনাংশ ডায়েরির এপাতায় ওপাতায়।'

এই গ্রন্থে বিভিন্ন ঢঙের হোলির গান ও তার স্বরলিপি দেওয়া আছে। গানগুলি মহারাজের নিজের লেখা। এর মধ্যে শুধুমাত্র দুটি গান বাংলায় লেখা। প্রথম গানটির কয়েক লাইন নিচে দেওয়া গেল—

আজু মধুর নিঠুর ঋতুরাজ বসন্তে—
বাজে গো বাঁশী যবে সুরে দূর দিগন্তে।।
একান্তে বসন্তে কান্তের কথা ভাবে যে বালা,

আজু ফাগুয়ার দিনে তার সনে খেলিবে খেলা,

সে যে নিঠুর কপট নাগর সদা রস রঙ্গা চায়,

সে যে ভ্রমরার মত চঞ্চল নানা ফুলে মধু খায়।

দ্বিতীয় বাংলা গানটিতে তাঁর মনের মর্ম বেদনার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর চারটি লাইন---

যে আশায় এতদিন পরাণ বাঁধিয়া,

ভেবেছিনু যবে আসিবে হোলিয়া,

সে হোলী আসিয়া গিয়াছে চলিয়া,

আমার খেলা ত হল না খেলা।

এছাড়া ব্রজবুলি ঢং-এ এই গ্রন্থে আরও কিছু গান লিখেছেন। তারই একটি—

**মধুমাধবী সারং---কাওয়ালী**

চমকন লাগে তেরী বিন্দিয়া সেঁইয়া।

উরত অম্বর লালে বাদর।

বিজরী চমকে তেরী বিন্দিয়া সেঁইয়া

ঘটাঘন গরজত, দফা ডাম্বর

বরষে বারি পিচকারী রঙ্গিয়া।

মহারাজ বীরবিক্রম গদ্য রচনায়ও কুশলী ছিলেন। 'হোলী' গ্রন্থের 'অবতরণিকা'-র এক অংশে তিনি লিখেছেন---'জীবনপ্রভাতে যৌবনে ও নিশি প্রভাতের নবালোকে যেমন নরনারী আদিরস করে অনুভব, তদ্রূপ অজ্ঞানের প্রভাতে জ্ঞানের আলো যখন আসে তখনও আদিরস অনুভূত হয়। যখন জ্ঞানালোকের প্রভাবে মানবের পার্থিব ভোগলালসার সমাপ্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা অন্তর্হিত হইয়া বিমল শান্তি সুখ হয় উপভোগ, তখন তাহারা নিজস্বতার বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের বিরাট দেহে হইয়া লীন পরমাত্মা প্রীতিতে অদ্বৈতভাবে অবিরাম আরাম উপভোগ করে।'

মহারাজ বীরবিক্রমের পৃষ্ঠপোষকতায় কালীপ্রসন্ন সেনের সম্পাদনায় 'শ্রীরাজমালা' নামে রাজমালার চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। এছাড়া কালীপ্রসন্ন সেনেরই রচিত পাঁচজন মাণিক্য রাজাকে নিয়ে 'পঞ্চমাণিক্য' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বীরবিক্রমমাণিক্যের সুমধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ বৈশাখ তিনি কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজন্য আমলে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর মুখপত্র হিসেবে 'রবি' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এর সম্পাদক ছিলেন রাধাকিশোর মাণিক্যের পুত্র নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ। অবশ্য প্রথম দুই বৎসর তাঁর সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের নাম সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিল। পত্রিকাটি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মাত্র ছয় বৎসর জীবিত ছিল, কিন্তু উৎকর্ষতায় এটি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী স্থান লাভ করেছে। বাংলার শিক্ষিত সমাজ এই পত্রিকাটির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করত। গল্প, কবিতা, ইতিহাস, লোকসাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পকলা ইত্যাদির মননশীল আলোচনায় সমৃদ্ধ 'রবি' তৎকালীন বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় একটি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করেছিল। বাইরের অনেক বিশিষ্ট লেখকের রচনা এতে স্থান পেলেও স্থানীয় লেখকদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়েছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য নিয়ে বলা হয়েছিল—'কিশোর সাহিত্য সমাজ' স্থাপিত হওয়ার পর মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করার জন্য আমাদিগকে বলেন এবং উহার সর্বপ্রকার ব্যয় ভার গ্রহণ করবেন বলে আমাদের আশ্বাস দেন। কিন্তু আমাদের আশা ফলবতী হওয়ার পূর্বেই তিনি অক্ষয়ধামে যাত্রা করেন।

যা হোক আমাদের কয়েক সাহিত্য বান্ধব রাজকুমারগণের এবং কিশোর সাহিত্য সমাজের সদস্যবর্গের আন্তরিকতায় আজ এই ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হলো। বর্তমান মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরও তদীয় পকেট খরচ হতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করে স্বীয় সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ করেছেন। আমাদের এ পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে স্থানীয় লেখক লেখিকার লেখা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করা।'

বাইরের লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়ংবদা দেবী, পরিমল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। পত্রিকায় 'ভাবের ঝুলি' নামক বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও অন্যান্য লেখা থাকতো।

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর অনেক কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'রবি' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মাও কিছু কবিতা ও গান লিখেছেন। সূর্য সম্পর্কে তার একটি কবিতার চার লাইন---

উর্ধ্বে তোমার মুখটি রেখে
কিরণ শাখা আস্‌ল নেমে
আঁধার ভীতি উড়িয়ে দিয়ে
হাসল জগৎ আলোর প্রেমে।

আবার বৈষ্ণব পদাবলির অনুকরণে রাধার অভিসার বর্ণনায়---

হরি অনুরাগী রাধা।
মধুরিপু মোহিনী রমনী শিরোমণি
মাধব মুরলী সাধা।।
কুমুদিনী চুম্বই অলি অনুধাবই
রেণু কষায়িত দেহা
পুলক প্রমোদিনী চলল সুহাসিনী
বিজরিল নিজ গেহা।

এছাড়াও অনেক কবির রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রিকার প্রবন্ধকারদের মধ্যে অধিকাংশই স্থানীয় লেখক। 'বাঙ্গালা ভাষার চারি যুগ' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। কবি গোবিন্দ দাসের কবিতার ধারাবাহিক সমালোচনা করেন হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'ময়মনসিংহ গীতাবলী' প্রবন্ধে কাঞ্চনমালার কাহিনি বর্ণনা করেন। ত্রিপুরার

দেওয়ান সাধক কবি রামদুলাল ও কবি রামপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনা করেন বরদা রঞ্জন চক্রবর্তী। অন্যান্য স্থানীয় লেখকদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'ত্রিপুরার কার্পাস', ডাক্তার শরৎচন্দ্র দত্তের 'নিদ্রা', দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত লিখিত ভ্রমণ কাহিনী 'উত্তর পশ্চিমে ও কাশ্মীরে', উমাকান্ত একাডেমির প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক শীতলচন্দ্র চক্রবর্তীর বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ, তাঁর পুত্র ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ, ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার 'ত্রিপুরার মঠ ও মন্দির' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের 'হসমভোজন', 'ত্রিপুরায় সতীদাহ' প্রভৃতি প্রবন্ধ, ব্রজেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা পরিভাষা', যোগেশচন্দ্র দত্ত লিখিত 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া 'রবি' পত্রিকায় ত্রিপুরার লোককথা নিয়েও কাহিনি লেখা হত। রাজকুমারী নিরুপমা দেবীর 'অজগর সাপের গল্প', রাজকুমারী গোলাপ ফুল দেবীর 'সিপিং তুই মাইরুং তুই' এবং বীরচন্দ্র লাইব্রেরির তৎকালীন গ্রন্থাগারিক বিপিনচন্দ্র দেববর্মার 'ত্রিপুর পৌরাণিক কথা' বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে চৈত্র মাসে ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর 'রবি' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অজিত বন্ধু দেববর্মনের সম্পাদনায় 'পূবালী' নামে একটি সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করে, যার পরমায়ু এক বৎসরের অধিক ছিল না। এর লেখকদের অন্যতম ছিলেন সতীশচন্দ্র দেববর্মন, অজিতবন্ধু দেববর্মণ, রাজকুমারী সুচারা দেবী, মহারাজ কুমার হেমন্ত কিশোর দেববর্মণ প্রমুখ।

এছাড়া ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা সরকারের আনুকূল্যে শঙ্কর মোহন চট্টোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ত্রিপুরা' নামে একটি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, সতীশ দেববর্মণ, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বসু, শরৎ দত্ত, বি. শর্মার মত স্থানীয় লেখকরা।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'ত্রিপুরা বান্ধব' নামে আরেকটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। প্রথমে হাতের লেখায় প্রকাশিত হলেও পরবর্তী সময়ে রাজপুরুষ রানা বোধজং-এর ব্যয়ে তা 'রাজমালা' প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন অনিল চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন সুবোধ

নন্দী ও দুর্গাদাস গঙ্গোপাধ্যায়। পত্রিকাটির মান সেই সময়ের পাঠক গোষ্ঠীকে আকর্ষিত করেছিল।

এইসব থেকে বোঝা যায় যে সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষত, রাজপরিবারকে ঘিরে একটি শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। কাব্য-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাই রীতিমতো গদ্য চর্চারও একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, যার ফলে বেশকিছু গদ্যগ্রন্থও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। প্যারী মোহন দেববর্মার 'উনকোটি তীর্থ' (১৯২১ খ্রিস্টাব্দ); চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের 'শ্রীশ্রী যুতের কৈলাসহর ভ্রমণ'; মহিমচন্দ্র ঠাকুরের 'দেশীয় রাজ্য' (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ), 'রিয়া' (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ); মহারাজকুমার সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার 'ভারতীয় স্মৃতি' (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ); 'ত্রিপুরার স্মৃতি' (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ); 'আগ্রার চিঠি' (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ), 'জেবুন্নিসা বেগম' (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ), 'বাহাদুর শাহ্ আবু জাফর (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) এবং ওয়াকয়্যাতে ত্রিপুরা (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ); ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের 'উদয়পুর বিবরণ' (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ); নীলকণ্ঠ সেনের 'ত্রিপুরেশ্বরের উদয়পুর ভ্রমণ' (এই ত্রিপুরেশ্বর বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য); মহারাজ বীরবিক্রমের 'আমার সোনামুড়া উদয়পুর বিভাগ পরিভ্রমণ ডায়েরি'; কৃষ্ণজিৎ দেববর্মার 'তব স্মরণখানি' (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ), শীতল চক্রবর্তীর 'আদি আর্য্যভূমি', 'ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস' (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ), 'হিন্দুর ভূগোলবিদ্যা', 'ঐতিহাসিক কৌতুক রহস্য' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখকের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের 'উদয়পুর বিবরণ' ছাড়া তাঁর রচিত ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগের বিবরণ সহ আরও কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থে ভূমিকায় বলেছেন---'রাজকার্যের সুবিধার নিমিত্ত অমরপুর, কল্যাণপুর, বিশালগড় ও কমলপুর উপ-বিভাগগুলি এখন মূল বিভাগগুলির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উদয়পুর, ধর্মনগর, খোয়াই, সোনামুড়া, বিলনীয়া, সাব্রুম, কৈলাসহর ও আগরতলা সদর এই আটটি বিভাগেই রাজ্যের জ্ঞাতব্য মূল বিবরণগুলি সন্নিবিষ্ট হইল। যে যে বিষয়ে এক বিভাগের অবস্থা অন্য বিভাগের অনুরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, তৎ তৎ সম্পর্কে এক বিভাগে বিবরণ উল্লেখ করিয়া অন্য বিভাগে ওই সকলের পুনরুল্লেখ যথাসম্ভব পরিহার করা হইয়াছে।' ঐসব সময়ের ত্রিপুরার ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে এগুলি

আকর গ্রন্থ হিসেবেই বিবেচিত। বিংশ শতকের সত্তরের দশকে এগুলি ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার পুনর্মুদ্রিত করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

রাজপরিবারে এই সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহাওয়া ভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত রানীদেরও আন্দোলিত করেছিল। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের পত্নী ধর্মশীলা 'নানুয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। মহিমচন্দ্র ঠাকুর লিখেছেন—'এই ধর্মশীলা বা নানুয়া দেবী বঙ্গ ভাষায় পণ্ডিতা ছিলেন এবং পার্শী ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পার্শী ভাষায় গজল নাম সংগীতের কয়েক টুকরা সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদঞ্চলের উচ্চারণ দোষে ইহার পাঠ ঠিক করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালা ভাষায় একখানা গ্রন্থ ছিল, তাহার নাম এখন লুপ্ত। কেবলমাত্র একটা গানের পালা পর্ব্বত অঞ্চলবাসী লোকেরা গাহিয়া থাকে। তাহাও সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং সংগ্রহ করা শ্রম সাধ্য বটে।'

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মহিষী জাহ্নবী দেবী সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞা ছিলেন। মহিমচন্দ্র ঠাকুর আখাউড়া রেল স্টেশনের নিকটে রাধামাধবের মন্দিরের শিলালিপি জাহ্নবী দেবীর রচিত বলে জানিয়েছেন। তবে শিলালিপির শেষ লাইনে দ্বারপণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র শর্মার নামের উল্লেখ নিশ্চিত করে যে, মহারাণী শিলালিপি রচনায় এই দ্বারপণ্ডিতের সাহায্য নিয়েছিলেন। মহিমচন্দ্র ঠাকুর তাঁর রচিত রাধামাধবের উদ্দেশ্যে কিছু সংগীতেরও উল্লেখ করেছেন।

মহারাজ দুর্গামাণিক্যের (১৮০৯-১৩ খ্রিস্টাব্দ) পত্নী সুমিত্রা দেবী ভাগবত শাস্ত্রে বিশেষ বিদুষী ছিলেন। ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দিরে সংস্কার সংক্রান্ত দক্ষিণগাত্রের দ্বিতীয় শিলালিপিটি সম্ভবত তাঁরই রচিত। তাঁর কন্যা আনন্দময়ী দেবীও বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি ভাগবত পাঠ ছাড়াও রাসপঞ্চধ্যায় ব্যাখ্যাও করতেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের বহুমুখী প্রতিভার ধারাগুলির মধ্যে রাজপরিবারে যে ধারাটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সঞ্চারিত ছিল, তা হল সংগীতের ধারা। এদের মধ্যে ব্রজবিহারী দেববর্মণ (সংগীত ও নাটক), ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ (শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীত),হেমন্ত কিশোর দেববর্মণ (সেতার শিল্পী), অমলকৃষ্ণ দেববর্মণ (কণ্ঠশিল্পী, ঢাকা ও কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে তাঁর সংগীত প্রচারিত হয়েছে), ঠাকুর পুলিন দেববর্মণ (অত্যন্ত উঁচুমানের কণ্ঠশিল্পী, শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর বিশাল দক্ষতা ছিল), নরেন দেববর্মণ (রবীন্দ্র সংগীত), কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণ

(আধুনিক বাংলা গান), জ্যোতিষ দেববর্মণ (কণ্ঠশিল্পী) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মহারাজকুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মার পুত্র কুমার শচীন দেববর্মণ কলিকাতা ও মুম্বাইয়ের সংগীত জগতের এক নক্ষত্র ছিলেন। সেই ধারা বর্তমানে সঙ্কুচিত হলে এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

এককালে আগরতলায় রাজকুমারী ও রাজমহিষীরা নিজেরাই সংগীত রচনা করে তাতে সুর দিয়ে হোলির দল তৈরি করতেন, যাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত। এইসব দল গান গেয়ে আগরতলা শহর পরিক্রমা করত। মহারানী তুলসীবতী নিরক্ষর হলেও মুখে মুখেই গান রচনা করতেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের ভারত ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের অবসান হলেও ত্রিপুরার মহারাজারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আঙ্গিনায় যে ঐতিহ্য রেখে গিয়েছিলেন, তার উত্তরাধিকার নিয়েই স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরায় পরবর্তীকালের সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা বয়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে বিকচ চৌধুরী লিখেছেন---'শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা রাজধর্ম। কিন্তু শিল্প সাধনার ইতিহাসে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন অন্বিষ্ট সাধনায় সমর্পিত প্রাণ একের পর এক রাজপুরুষ। এমনতরো গৌরবের ইতিহাস ত্রিপুরা ছাড়া অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। ... যেখানে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর তাকে মুক্ত মনে তাঁরা এ জন্যই বরণ করতে পেরেছিলেন, কেননা তাঁরা নিজেরা ছিলেন মহৎ স্রষ্টা। ... তাঁরা কাব্য লিখেছেন, গান গেয়েছেন, ছবি এঁকেছেন। রাজপুরুষদের এই অসামান্য গুণের উত্তরাধিকার অবশ্যই পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। শিল্পবোধ এখানে জনজীবনের অঙ্গীভূত।'

**সংযোজন :-**

আমরা দেখেছি অনেক আগে থেকেই ত্রিপুরায় বাংলা ভাষার চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে বাংলার ব্যবহার তখন থেকেই চালু হয়ে গিয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। তবে অবশ্যই রত্নমাণিক্য (১ম)-এর আমলে বঙ্গের মত সেরেস্তা গঠন একে আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু ওই সময় থেকে মুদ্রা, তাম্রশাসন ইত্যাদিতে সংস্কৃত ভাষায় বাংলা হরফের ব্যবহার ছাড়া কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে না। ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষায় বাংলা গদ্যের প্রথম রূপটি আমরা দেখতে পাই ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে কল্যাণমাণিক্যের একটি ব্রহ্মোত্তর দানের তাম্রশাসনে—'স্বস্তি—শ্রীশ্রীযুক্ত কল্যাণ

মাণিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজানামাদেশোয়ং শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজিতে হন্যৎ পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণা নুরনগর মৌজে বাউরখাড় অজ্জঙ্গলাতে শতদ্রোণভূমি প্রীতে শ্রীমুকুন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যকে দিলাম ইহা আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে রহুক এহি ভূমির মাল খাজানা গয়রহ সমস্ত নিষেধ ইতি শকাব্দা ১৫৭৩ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ।'

এই তাম্রশাসন সম্পর্কে সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন---'বেশ বুঝা যায়, সংস্কৃতের আদলে নিতান্ত দেশী উপকরণে ঐ গদ্যের কাঠামো তৈরী হয়েছিল অনেকদিন আগেই।' সংস্কৃত পত্রের মতই রাজার নামের পরে সুনির্বাচিত কিছু বিশেষণ জুড়ে তারপর প্রচলিত ব্যবহারিক সাবলীল গদ্যে মূল বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। তৎসম ও দেশী শব্দ ছাড়াও আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে প্রয়োজন মতো ব্যাকরণের নিয়মাবিধির তোয়াক্কা না করেই। তবে আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে এই প্রশাসনিক ভাষায় নির্বিচারে আরবি-ফার্সি দুর্বোধ্য শব্দ ঢুকে পড়ায় এর সুখপাঠ্যতা হ্রাস পায়।

ত্রিপুরার এই সনদী ভাষা তার কথ্যরীতি ছেড়ে সাধু গদ্যে পরিণত হয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে। রাজকীয় বিধি ও নিয়মাবলি এবং আদালতের কাজকর্ম যাতে সুললিত বাংলা গদ্যে সম্পাদিত হয় তার জন্য তিনি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আদেশনামা জারি করেন। প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষার কাঠামো যাতে 'সাধারণের বোধগম্য রূপে প্রচলিত সুললিত সাধু সরল ভাষায়' হয় তা জানিয়ে দেন। রাধাকিশোর মাণিক্যও এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই প্রশাসনিক কাজে ইংরেজির অনভিপ্রেত মৃদু অনুপ্রবেশ দেখা যায়। কিন্তু তবুও রাজন্য ত্রিপুরার সরকারি ভাষা বাংলাই ছিল।

রাজ্যের ভারত ভুক্তির পর ইংরেজিই প্রশাসনিক ভাষা হয়। পরবর্তীকালে বাংলা ও ককবরক সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও সেই রেওয়াজ আজও চালু আছে।

# ৩ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

রাজতন্ত্র অথবা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জনকল্যাণমুখী কোনও পদক্ষেপের স্থান ছিল না। কর আদায় অথবা উৎসবে, দুর্ভিক্ষে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া প্রজাদের সঙ্গে রাজার বা রাজপ্রশাসনের বড় কর্তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। জনকল্যাণমুখী কোনও পরিকল্পিত ব্যবস্থার ধারণাই ছিল না। তবুও কোনও কোনও রাজা যে প্রজাদরদী ছিলেন না এমন নয়, তবে তা ছিল নেহাতই ব্যক্তিগত। সেসব যুগে ব্রাহ্মণদের দাপট ছিল বেশি, তাই রাজাদের দান-ধ্যানের প্রায় সবটাতেই ছিল তাদের অধিকার। এই কারণেই সর্বত্রই ইতিহাসের উপাদান তাম্রপত্র, শিলালিপি ইত্যাদিতে তাদেরই ভিড়। রাজমালাও এর ব্যত্যয় নয়। প্রত্যেক রাজার ইতিহাস বর্ণনায় ব্রাহ্মণদের প্রচুর দানকর্মের উল্লেখ আছে। সাধারণ প্রজার ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যবহার অথবা অবদানের কথা প্রায় নেই বললেই চলে। তবু তাঁরা যে সাধারণ প্রজাদের কথাও ভাবতেন, দুই একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়।

আগে ত্রিপুরা রাজ্যে নরবলি প্রথা প্রবলভাবে চালু ছিল। ধন্যমাণিক্য এই নরবলি প্রথা রদ করেন—

পূর্ব্বেতে ত্রিপুর রাজার নরবলি ছিল।
শ্রীধন্যমাণিক্য হতে নিষেদ করিল।।

দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্য (১৫৩২-৬৪ খ্রিস্টাব্দ) নাবালক অবস্থায় রাজা হলে তাঁর সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ বকলমে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। দৈত্যনারায়ণের ভাই দুলর্ভ নারায়ণ লম্পট ছিলেন। একবার—

মাধবতলার হাট পরম সুন্দরি।
কচরির সাক বেচে দরিদ্রের নারি।।
দোলাতে চড়িয়া জাএ দুল্লভনারায়ণ।
বল করি নিয়া গেল সুন্দরী তখন।।

রাজার কাছে ওই নারীর স্বামী নালিশ করলেও রাজা কোনও ব্যবস্থা নিতে

অক্ষম ছিলেন। এই অবিচারের জন্য রাজার মর্মবেদনা এভাবে রাজমালায় দেওয়া হয়েছে---

এত সুনি মহারাজা মনে ভাবে সোক।

কেমত করিয়া মোর রার্য্যে রব লোক।।

আমি রাজা হৈল বোজি পাপের কারণ।

এহি পাপে হৈব মোর নরকে গমন।।

একে নিব অন্য নারি এত অবিচার।

রাজা হৈয়া আমি তারে নারি বুজিবার।।

গোমতী নদীর জলপ্লাবনে মেহেরকুল পরগণায় প্রতি বৎসরই প্রচুর শস্যহানি হতো। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে নদীর দুই তীরে উঁচু আইল (বাঁধ) নির্মাণ করে দেন।

এছাড়া অনেক রাজারাই জনসাধারণের পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে অনেক দীঘি নির্মাণ করেন।

মধ্যযুগে শিক্ষার চাহিদা সাধারণ্যে ছিল না। দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ অথবা বার্ষিক বিভিন্ন কর দেওয়ার ক্ষেত্রে সামান্য গণনাকার্য অনেক সময় মুখে মুখেই অথবা হাতে গুণে করা সম্ভব হত। অনেক ক্ষেত্রে লেনদেন বিনিময় পদ্ধতিতেই হত। তবে বাংলাদেশে মুসলমান যুগে বিশেষত মোগল আমলে জমির পাট্টাদানে লেখাপড়া অথবা রাজস্ব মুদ্রার বিনিময়ে মেটানো হতো বলে বাংলাদেশে সেরেস্তার কাজে অসংখ্য লোকের প্রয়োজনে সমৃদ্ধ গ্রামে গ্রামে দেশীয় পাঠশালা গড়ে উঠে। পরবর্তী সময়ে এই পাঠশালায় নিম্নবিত্তের সন্তানরা দলে দলে যোগ দিতে থাকে। এইসব পাঠশালায় অক্ষর পরিচয়, চিঠিপত্র লেখা, কিছু গাণিতিক হিসাব ছাড়াও ঘরকালি, পুষ্করিনীকালি, নৌকাকালি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপের পাঠ্যক্রম থাকত। এইসব দেশীয় পাঠশালায় একজন গুরুমশাই থাকতেন, যার বেতন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাই মেটাতো।

'ত্রিপুর দেশের কথা'-য় অহোম রাজার দুই দূত রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস রাজধানীর বিবরণে বাজার-হাট, বাংলাদেশের সঙ্গে গোমতী নদীর তীরের

বন্দরটিতে দৈনিক কেনা-বেচার চিত্র অঙ্কনে ওই সময়ে ত্রিপুরার একটি গতিময় অর্থনৈতিক চিত্রের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে, ওই সময়ে অন্তত রাজধানীতে একাধিক দেশীয় পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল। প্রশাসনের কাজে ও সেরেস্তায় রাজকর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী, স্বর্ণকার, মুদ্রাশিল্পী ইত্যাদি; এদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও লেখাপড়া ও গণনা শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এদের জন্যই দেশীয় পাঠশালার প্রয়োজন ছিল। সেসবই অভিভাবকদের অর্থে চলত, তবে রাজকর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য পাঠশালার ব্যয়ভারে সম্ভবত আবেদনের ভিত্তিতে সামান্য অনুদান মিলত। অন্তত, বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বের শুরু পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

অপরপক্ষে, প্রজাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের নিজেদেরই ব্যবস্থা করে নিতে হত। এ বিষয়ে তাদের ভরসা ছিল তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, আচার্য বা বৈদ্যগণ। আর্থিক স্তর ভিত্তিতে চিকিৎসার তারতম্য ঘটত।

কিন্তু ভারতে ব্রিটিশদের আগমনে এর পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। ইউটিলিটেরিয়ান তত্ত্বের অনুসারী এই ইংরেজরা প্রজাদের জন্য কিছু জনকল্যাণসূচি গ্রহণ করে, যার মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যই প্রধান। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর তারা দেশীয় রাজ্যগুলিতেও তাদের শাসন ব্যবস্থার মত করে সংস্কার কার্য চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও ত্রিপুরা তাদের অনুগত রাজ্যগুলির মধ্যে কখনই ছিল না, তবু তারা এখানেও পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগ করে মহারাজ বীরচন্দ্রকে প্রশাসনিক সংস্কারে চাপ প্রয়োগ করে।

কিন্তু স্বাধীনচেতা বীরচন্দ্রমাণিক্য তাদের এই খবরদারি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। ফলে সংস্কার প্রক্রিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়। প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট এ. ডবলিউ. বি. পাওয়ার ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট আগরতলায় পা রাখেন, তখন সারা রাজ্যে একমাত্র রাজধানী আগরতলায় সরকারি অনুদানে একটি মাত্র স্কুল ছিল, যার মান ছিল ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী মাইনর (বর্তমানের ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত) পর্যায়ের, যাতে বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়ানো হত। এতে সরকারের অনুদান ছিল মাসিক ৩০ টাকা। এতে ঠাকুরদের সন্তান ও রাজকর্মচারীদের সন্তানরাই মূলত পড়ত। তাদের বেতন দিতে হত। পাওয়ার সাহেব ১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে এর মোট

ছাত্র সংখ্যা ৭৯ বলে জানিয়েছেন। মহারাজের অনুদানে স্কুলটি চলত বলে একে তিনি 'মহারাজার স্কুল' বলা হত বলে ওই প্রতিবেদনে জানিয়েছেন।

স্কুলটির বিষয়ে নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা তাঁর 'আবর্জনার ঝুড়ি'তে জানিয়েছেন---'আমাদের ইংরেজি অধ্যয়নারম্ভের কিছুকাল পূর্বে তিনি একটি অবৈতনিক বঙ্গ বিদ্যালয় (ব্রিটিশ ভারতের স্কুলের বিধি ব্যবস্থায় পরিচালিত সাধারণের প্রবেশগম্য আদি বিদ্যালয় ত্রিপুরায় পাশ্চাত্য শিক্ষার Genisis) স্থাপন করিয়াছিলেন।'

কিন্তু ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্ট অনুসারে, তা অবৈতনিক ছিল না। স্কুলটির প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে ১৮৭৩-৭৪ খ্রিঃ বর্ষে মহারাজা অনুদান বাড়িয়ে তা মাসিক ৫০ টাকা করেন, কিন্তু তা পর্যাপ্ত না হওয়ায় পরবর্তী বছরেই অনুদান বাড়িয়ে বার্ষিক ১৩৫০ টাকা করেন। এই সময় থেকেই স্কুলটি অবৈতনিক হয়ে পড়ে।

প্রশাসনিক সংস্কারের সঙ্গে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে আগরতলার সন্নিকটে খ্রিস্টান গ্রাম মরিয়মনগরে ৫ জন বালিকাকে নিয়ে ত্রিপুরার প্রথম মেয়েদের স্কুল খোলা হয়। স্কুলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৮৮০-৮১ খ্রিঃ বর্ষে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা ৩১ হয়। যাতে ৫৭৩ জন বালক এবং ৭৪ জন বালিকা পড়ত। এরপরই তীব্র আর্থিক সংকটে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা ১৫-তে নেমে যায়, যাতে ৪২৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়ত। ১৮৮৬-৮৭ সালে রাজ্যে সরকারি অনুদানে চালু শেষ বালিকা বিদ্যালয় দুটিও লুপ্ত হয়। ১৮৯০-৯১ খ্রিঃ বর্ষে (যখন উমাকান্ত দাশ মন্ত্রীপদে দায়িত্ব নিয়েছিলেন) রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯ (সদরে ৬টি, সোনামুড়ায় ৪টি, বিলোনীয়ায় ১টি এবং কৈলাসহর বিভাগে ৮টি) এবং তাতে ৬২৪ জন ছাত্র (ঠাকুর-৫১, মণিপুরি-১১৭, ত্রিপুরি-৪৪, কুকি-৪, বাঙালি হিন্দু-২১৭, বাঙালি মুসলমান-১৭১, খ্রিস্টান-৬ এবং অন্যান্য-১৪) ছিল।

এরপর ধীরে ধীরে স্কুলের সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে এবং বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৮৯৬-৯৭ বর্ষে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৩৬-এ দাঁড়ায়, তবে এর সবগুলিই ছেলেদের জন্য।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের শেষ বছরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট এখনও আমাদের

হাতে আসেনি। ১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ বর্ষের স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যান পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলেই ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মন্ত্রী উমাকান্ত দাশের বিশেষ উদ্যোগে আগরতলার স্কুলটি এন্ট্রান্স অর্থাৎ হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে কৈলাশহরের স্কুলটি মধ্য ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয়। সোনামুড়া, বিলোনীয়া, খোয়াই এবং ধর্মনগরের বিভাগীয় স্কুলগুলি মধ্য ইংরেজি পর্যায়ে উন্নীত না থাকলেও স্কুলগুলিতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য স্কুলগুলির মধ্যে প্রায় সবই সমতলে অবস্থিত ছিল। এগুলির সবই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। ছাত্রদের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

পার্বত্য অঞ্চলে ওই সময়ে প্রতিবন্ধক ছিল যোগাযোগের অপ্রতুলতা এবং দ্বিতীয়ত, শিক্ষকের অভাব। ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টরা এ বিষয়ে খুব একটা সাফল্যের প্রত্যাশীও ছিলেন না। সি. ডবলিউ. বোল্টন ১৮৭৭-৭৮ সালের অ্যাডমিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্টে এর জন্য দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন---১) পর্বতবাসীদের অনাগ্রহতা, তারা মনে করতেন যে পড়াশোনা করলে ছেলেরা বাবু হয়ে যাবে, জুম চাষের জন্য তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না। ২) যেহেতু তাদের পড়ার মাধ্যম হবে বাংলায়, কিন্তু বাঙালি শিক্ষক ওই দুর্গম এলাকায় সহজে যেতে চাইবে না, আর গেলেও যে উচ্চ হারে বেতন দিতে হবে, তা সরকারের পক্ষে সহজ হবে না।

তিনি এ বিষয়ে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ওইসব এলাকার কিছু নির্বাচিত ছেলেদের আগরতলায় এনে প্রশিক্ষিত করে তাদের দিয়ে ওইসব দুর্গম এলাকায় স্কুল খুললে পার্বত্য জাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সম্ভব। কিন্তু জুম চাষের প্রয়োজনে স্কুল খুললেও তা ছাত্রশূন্য হয়ে পড়ে থাকাই সম্ভব বলেও আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

উমাকান্ত দাশ মন্ত্রী হওয়ার পর এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের এক প্রসিডিং-এ এর প্রমাণ মেলে। এতে বলা হয়েছে---'এ রাজ্যের প্রজা সংখ্যার তুলনায় বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা নিতান্ত কম। রাজধানী ব্যতীত এ রাজ্যের সর্বত্রই নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাহাদিগের অধিক নয়। তাহাদের অবস্থা এবং অভাব অনুসারে সুপ্রণালী মতে

## ১৮৯৪-৯৫ সালের স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা

| বিভাগ | মোট স্কুল | মোট ছাত্র | ছাত্রদের জাতি | | | | | | | | দৈনিক উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ঠাকুর | মণিপুরি | ত্রিপুরি | কুকি | বাঙালি হিন্দু | বাঙালি মুসলমান | খ্রিস্টান | অন্যান্য | |
| সদর | ১০ | ৪৪৮ | ৫৬ | ৬৪ | ৩৩ | ০ | ১৮৪ | ৮৫ | ১১ | ১৫ | ৩৪২.৮৯ |
| সোনামুড়া | ৮ | ১৮৯ | ২ | ০ | ৩১ | ০ | ৬১ | ৮২ | ০ | ১৩ | ১৩২.৪১ |
| বিলোনীয়া | ৫ | ১৩৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫৪ | ৮৩ | ০ | ০ | ৯৫.৩৬ |
| কৈলাশহর | ১২ | ৩০৬ | ০ | ১৭৪ | ০ | ১৫ | ৬৫ | ৫০ | ০ | ২ | ২৩৪ |
| সর্বমোট | ৩৫ | ১০৮০ | ৫৮ | ২৩৮ | ৬৪ | ১৫ | ৩৬৪ | ৩০০ | ১১ | ৩০ | ৮০৪.৬৬ |

গঠিত পাঠশালার শিক্ষাই প্রচুর হইবার কথা; অতএব উপযুক্ত প্রণালীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পাঠশালা স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।'

এরই সূত্র ধরে রাজধানীর বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর কমপক্ষে আটজন পাঠশালার শিক্ষকের শিক্ষণের জন্য একটি বিশেষ শ্রেণি খোলা হয়। এই আটজনের মধ্যে দু'জন বাঙালি, দু'জন ত্রিপুরি, দু'জন মণিপুরি ও দু'জন কুকি হালাম হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষক মনোনয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় যেখানে পাঠশালা আছে অথবা খোলা হবে সেইসব স্থানের জনগণের উপর। প্রশিক্ষণের সময় ছিল এক বছর।

এইভাবে দুর্গম অঞ্চলে পার্বত্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলের শেষভাগ থেকে শুরু হয়। এইসব হবু শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন ও শিক্ষান্তে পাঠশালায় শিক্ষকতা করার জন্য সরকারী বৃত্তি ছিল মাসিক পাঁচ টাকা।

সংস্কার প্রক্রিয়ার হাত ধরে বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য আগরতলায় একটি ডিসপেনসারি চালু হয়। এর প্রথম চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ স্টর্ক। এতে অন্তর্বিভাগ চালু ছিল, যাতে স্বল্প রোগীর ক্ষেত্রে ভর্তির সুযোগ ছিল। পরবর্তীকালে রাজ্যে বিভিন্ন বিভাগ চালু হলে প্রতিটি বিভাগের সদরে একটি করে ডিসপেনসারি চালু হয়। এগুলি হল কৈলাশহর, সোনামুড়া ও বিলোনীয়া। ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ বর্ষে বীরচন্দ্রমাণিক্য পুরাতন আগরতলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে রাজপ্রাসাদের জন্য নির্ধারিত ডিসপেনসারিটিও সেখানে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮৯-৯০ সালে রাজপ্রাসাদের এই ডিসপেনসারির সঙ্গে জনসাধারণের জন্য একটি বহির্বিভাগ খোলা হয়। ১৮৯৩-৯৪ সালে খোয়াই, কমলপুর এবং ধর্মনগর—এই তিনটি নতুন বিভাগ খোলার পরিকল্পনায় এই তিনটি স্থানে ডিসপেনসারি খোলা হয়। এদের মধ্যে কমলপুর বিভাগটি বাস্তবায়িত না হলেও ডিসপেনসারিটি চালু থাকে। এইসব ডিসপেনসারিতে চিকিৎসা বিনামূল্যে হত। রাজ্যে বসন্ত রোগের প্রকোপ থাকায় এই ডিসপেনসারিগুলির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৯৪-৯৫ সালে রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার চিত্র পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

## ১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ বর্ষের স্বাস্থ্য চিত্র

| ডিসপেনসারির নাম | বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা | অন্তর্বিভাগে রোগীর সংখ্যা | সর্বমোট রোগীর সংখ্যা | অস্ত্রোপচার সংখ্যা | টীকাকরণের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. আগরতলা দাতব্য চিকিৎসালয় | ৮,৪৭৪ | ১৯৩ | ৮৬৬৭ | ১০৫ | ৪৬০ |
| ২. পুরাতন আগরতলা দাতব্য চিকিৎসালয় | ৭,৬৩৬ | ০ | ৭৬৩৬ | ৫৫ | ০ |
| ৩. খোয়াই দাতব্য চিকিৎসালয় | ৯৬ | ০ | ৯৬ | ০ | ১০২ |
| ৪. সোনামুড়া দাতব্য চিকিৎসালয় | ১,০৮১ | ২০ | ১,১০১ | ২৭ | ৩৪৬ |
| ৫. বিলোনীয়া দাতব্য চিকিৎসালয় | ৯৪৪ | ১৬ | ৯৬০ | ৩৫ | ৩৪৪ |
| ৬. কৈলাশহর দাতব্য চিকিৎসালয় | ১,৩০৩ | ৮২ | ১,৩৮৫ | ১০ | ০ |
| ৭. কমলপুর দাতব্য চিকিৎসালয় | ২৫৯ | ৬ | ২৬৫ | ৪ | ৩০ |
| ৮. ধর্মনগর দাতব্য চিকিৎসালয় | ৪৪ | ০ | ৪৪ | ০ | ৯৬ |
| মোট | ১৯,৮৩৭ | ৩১৭ | ২০,১৫৪ | ২৩৬ | ১,৩৭৮ |

এসব ছাড়াও বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে ১৮৭১ সালে আগরতলায় পৌরসভা গঠিত হয়। ১৮৭৫ সালে রাজ্যের প্রথম ডাকঘর রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যের আইন কানুন সমূহ বিধিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হয়। ১৮৭৮ সালে রাজ্যে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় অথবা বন্ধক দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। ১৮৮৯ সনে রাজ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। এছাড়া তাঁর আমলে কিছু রাস্তাও নির্মিত হয়। চাকলা রোশনাবাদের কুমিল্লায় মহারাজার অর্থানুকূল্যে বীরচন্দ্র গ্রন্থাগার ও টাউন হলের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরই আমলে ত্রিপুরায় আধুনিক যুগের প্রবেশ ঘটেছিল বলেই তাঁকে আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলা যায়।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর রাধাকিশোরমাণিক্য রাজ্যভার গ্রহণ করার পর রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়। ১৮৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজ্যভার থেকে শুরু করে ১৯০৯ সালের ১২ মার্চ তাঁর অকালমৃত্যুর সময় পর্যন্ত রাজ্যে বিদ্যালয় সংখ্যা ৩৬ থেকে বেড়ে ১৪৪-এ দাঁড়ায়।

১৯০২-০৩ খ্রিঃ বর্ষের প্রতিবেদনে জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। ওই প্রতিবেদনে পরিস্থিতি অনুসারে প্রত্যেকটি পাঠশালাকে চালু রাখার জন্য ৪ অথবা ৫ টাকার অনুদান দেওয়া হয়। এছাড়া অন্তত বিশ জন ছাত্র পাওয়া যায় এমন প্রতিটি গ্রামে অথবা সন্নিকটস্থ কয়েকটি গ্রাম মিলে একটি করে পাঠশালা খোলার জন্য আইন প্রণয়নও করা হয়। ফলে রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত পাঠশালা গড়ে উঠে।

রাধাকিশোর মাণিক্য শিক্ষার আঙ্গিনার প্রতিটি অঙ্গাকে স্পর্শ করে রাজ্যে একটি সর্বাঙ্গীন শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত করে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষের জন্য যেমন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ তিনি করে গিয়েছিলেন, তেমনি প্রশাসনের উপযুক্ত কর্মচারী গড়ে তোলার জন্য উচ্চশিক্ষারও সুযোগ তৈরি করেছিলেন। উচ্চশিক্ষা যাতে কেবলমাত্র রাজধানী কেন্দ্রিক না হয়ে বিভাগগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে সেই জন্য স্থানীয় জনগণের চাহিদায় সাড়া দিয়ে কৈলাশহর ও বিলোনীয়ার বিভাগীয় মধ্য ইংরেজি স্কুল দুটিকে এন্ট্রান্স স্কুলে উন্নীত করার ঘোষণা দেন, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আসতে দেরী হওয়ায় এগুলি উমাকান্ত একাডেমির 'ফিডার স্কুল' হিসেবে কাজ করতে থাকে।

এ রাজ্যের মানুষ যাতে উচ্চশিক্ষার আরও সুযোগ পেতে পারে, সেজন্য

রাধাকিশোর মাণিক্য ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাজধানীর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের (বর্তমান উমাকান্ত একাডেমি) প্রাঙ্গণেই কলা বিভাগের একটি দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজ চালু করেন। কলেজটি মূলত ঠাকুর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য খোলা হলেও এতে সকলেই সমানভাবে সুযোগ পেত। রাধাকিশোরমাণিক্যের অবৈতনিক শিক্ষা নীতির জন্য বাংলাদেশের আশেপাশের কলেজ থেকে বিনা বেতনে পড়তে অনেক ছাত্র এই কলেজে চলে আসে। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কায় কলেজটি বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের চাপ আসে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই কলেজের অনুমোদন দিতে অস্বীকার করে। ফলে মহারাজকে ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে বাধ্য হয়ে কলেজটিকে বন্ধ করে দিতে হয়।

যেহেতু ঠাকুর সম্প্রদায় বংশানুক্রমে প্রশাসনের উচ্চপদগুলিতে অধিষ্ঠিত হতেন, তাই তাদের উপযুক্ত শিক্ষা যেন অল্প বয়স থেকেই যত্ন সহকারে সম্পাদিত হয়, তার জন্য তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে একটি 'ঠাকুর বোর্ডিং' হাউস প্রতিষ্ঠা করেন। এই বোর্ডিং-এ যারা ভর্তি হত, তাদের সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করত। তাদের প্রাইভেট পড়ানোর জন্য একজন গ্র্যাজুয়েট ও একজন নন-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকও সরকার থেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

নারী শিক্ষায় রাধাকিশোর মাণিক্যের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে মেয়েদের জন্য স্কুল চালু হলেও ১৮৮৬-৮৭ সালে সবগুলি মেয়েদের স্কুল লুপ্ত হয়ে যায়। এরপর তাঁর আমলে সুদীর্ঘ দশ বছরে মেয়েদের জন্য কোনও স্কুল খোলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু রাধাকিশোর মাণিক্য সিংহাসনে বসার পরের বছরই সরকারি উদ্যোগে আগরতলা ও কৈলাসহরে দুটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আগরতলার বালিকা বিদ্যালয়টি প্রকৃতপক্ষে রাধাকিশোর মাণিক্যের পত্নী তুলসীবতী দেবীর সৃষ্টি। মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ-স্মরণিকায় অপরাজিতা রায়ের একটি প্রবন্ধে জানা যায় যে, এই বিদ্যালয়ের আরম্ভ রাজবাড়ির অন্দরে ১৩০৩ ত্রিপুরাব্দের ২৬ চৈত্র অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিলে। ওই সময়ে যুবরাজপত্নী তুলসীবতী সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে এবং অর্থ ব্যয়ে রাজবাড়ির মেয়েদের জন্য এই স্কুলটি চালু করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে মহারাজ

রাধাকিশোরমাণিক্য স্কুলটিকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে রাজবাড়ির অন্দর মহল থেকে বাইরে এনে বর্তমানের আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম অঞ্চলে স্থাপন করেন। তাঁর আমলে রাজ্যে ৯টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

রাজ্যের যুবকদের মধ্যে স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে রাধাকিশোরমাণিক্য রাজ্যে সর্বপ্রথম কারিগরি শিক্ষার সূচনা করেন। ১৯০৩ সালে মহারাজা তাঁর সুহৃদ বাংলার তৎকালীন সদ্য প্রাক্তন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর জন উডবার্নের স্মৃতিতে রাজ্যে 'উডবার্ন আর্টিজান স্কুল' নামে একটি কারিগরি শিক্ষার স্কুল চালু করেন। এতে কাঠের কাজ, লোহার (কামারের) কাজ এবং টিন ও পিতলের কাজ নিয়ে তিনটি বিভাগ চালু হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই এতে 'ফিটার'-এর কাজ অন্তর্ভুক্ত হয়। পরের বছরের প্রথম দিকেই 'কাশীপুর মডেল ফার্ম'-এর রেশম গুটি শিল্প সংক্রান্ত তাঁত বোনার স্কুলটিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শিক্ষায় উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে রাধাকিশোর মাণিক্য ব্যাপকভাবে মেধাবৃত্তি চালু করেন, যা পাঠশালা থেকে কলেজ পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। পার্বত্য বালকদের বৃত্তি দিয়ে আগরতলায় পড়ানোর উদ্যোগ মহারাজা ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রহণ করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, রাজধানীতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ভবিষ্যতে তার সদব্যবহার করা। রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররাও যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারে, সেজন্য কলেজের জন্য একটি ছাত্রাবাস ও হাই স্কুলটির জন্য দুটি ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়েছিল। স্কুলের ছাত্রাবাসগুলির মধ্যে একটি বাঙালি ছাত্রদের জন্য ও অন্যটি মণিপুরি ও ত্রিপুরিদের জন্য ধার্য ছিল। এছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে ঠাকুর বালকরা ছাড়াও সাধারণ শ্রেণির ছাত্রদের পাঠানো হতো। এদের সাধারণ বিভাগ ছাড়াও চিকিৎসা, চারুশিল্প ও কারিগরি বিভাগ পড়ানো হত, যাতে তাদের ভবিষ্যতে রাজ্যের প্রশাসনে নিযুক্ত করা যায়। রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বের শেষভাগে রাজ্যের শিক্ষার চিত্রটা কিরূপ ছিল, তা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

এই ১৪৪টি স্কুলের মধ্যে তিনটি হাইস্কুল, চারটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়, মেয়েদের জন্য একটি উচ্চ বাংলা বিদ্যালয়, ১১টি নিম্ন বাংলা বিদ্যালয়, বালকদের জন্য ১১৩টি পাঠশালা, মেয়েদের জন্য ৮টি পাঠশালা, দুটি মাদ্রাসা, একটি সংস্কৃত টোল এবং একটি কারিগরি বিদ্যালয় ছিল।

## ১৯০৮-০৯ খ্রিঃ বর্ষের শিক্ষা চিত্র

| বিভাগ | বিদ্যালয়ের সংখ্যা | | | ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | | | জাতি | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | ঠাকুর | মণিপুরি | ত্রিপুরি | রিয়াং | কুকি | বাঙালি হিন্দু | বাঙালি মুসলমান | খ্রিস্টান | অন্যান্য |
| সদর | ৫০ | ২ | ৫২ | ১৬৭৩ | ৮৯ | ১৭৬২ | ১২২ | ২৯৮ | ২২২ | ০ | ০ | ৬১৩ | ৫০০ | ৪ | ৩ |
| কৈলাশহর | ২০ | ৩ | ২৩ | ৬৮১ | ৪২ | ৭২৩ | ১ | ২৫৬ | ০ | ০ | ১৯ | ২৫৭ | ১৮৮ | ০ | ২ |
| সোনামুড়া | ১৭ | ১ | ১৮ | ৭০৫ | ১০ | ৭১৫ | ০ | ০ | ৪৪ | ০ | ০ | ১৬৮ | ৫০৩ | ০ | ০ |
| বিলোনীয়া | ১৪ | ০ | ১৪ | ৬৬০ | ২৫ | ৬৮৫ | ০ | ০ | ২৩ | ০ | ০ | ৩৮২ | ২৬৪ | ০ | ১৬ |
| খোয়াই | ৮ | ১ | ৯ | ১৫৬ | ৯ | ১৬৫ | ০ | ৪০ | ৭৪ | ০ | ০ | ২৪ | ৭ | ০ | ২০ |
| ধর্মনগর | ১৩ | ২ | ১৫ | ৪১৪ | ৫৩ | ৪৬৭ | ০ | ১২৯ | ০ | ০ | ০ | ২৫০ | ৮৫ | ০ | ৩ |
| উদয়পুর | ১৩ | ০ | ১৩ | ২৮২ | ২ | ২৮৪ | ০ | ০ | ৮৫ | ০ | ৫২ | ৩৩ | ৯৬ | ০ | ১৮ |
| মোট | ১৩৫ | ৯ | ১৪৪ | ৪৫৭১ | ২৩০ | ৪৮০১ | ১২৩ | ৭২৩ | ৪৪৮ | ০ | ৭১ | ১৭২৭ | ১৬৪৩ | ৪ | ৬২ |

১৮৯৪-৯৫ সালে বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলের শেষভাগে শিক্ষা খাতে খরচ যেখানে ৮,০৫১ টাকা ১০ আনা ৩ পাই ছিল, সেখানে রাধাকিশোরমাণিক্যের রাজত্বের শেষভাগে ১৯০৮-০৯ সালে শিক্ষা খাতে মোট ব্যয় ছিল ৫৬,৯২৩ টাকা। এর মধ্যে রাজকুমারদের জন্য ব্যয় ছিল ৭,৮৭৬ টাকা এবং ঠাকুরদের ছেলেদের জন্য ব্যয় ১১,৯৯৬ টাকা। বাকিটা ছিল জনসাধারণের শিক্ষার জন্য খরচ (এর মধ্যে শুধু স্কুলগুলির জন্য ব্যয়ই ৩২,৪৪৬ টাকা)।

রাধাকিশোরমাণিক্য রাজ্যে ৮টি ডিসপেনসারি নিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯০৮-০৯ সালে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১২টি ডিসপেনসারি দেখতে পাই, অর্থাৎ তাঁর আমলে মাত্র ৪টি ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ডিসপেনসারিগুলিতে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা এবং ব্যয়িত অর্থ প্রমাণ করে যে, রাধাকিশোরমাণিক্য এই ডিসপেনসারিগুলির গুণমান বৃদ্ধিতে কতটা সচেষ্ট ছিলেন। রাধাকিশোরমাণিক্য প্রতিটি ডিসপেনসারির সঙ্গে হাসপাতাল অর্থাৎ অন্তর্বিভাগে রোগী রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, যা আগে ছিল না। রাজধানীর ডিসপেনসারিটিকে একটি ৫০ শয্যার হাসপাতালে রূপান্তরিত করে সদ্য প্রয়াত ভারতেশ্বরী রানী ভিক্টোরিয়ার নামে উৎসর্গ করে এর নাম 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল' রেখেছিলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলের শেষভাগে ১৮৯৪-৯৫ সালে স্বাস্থ্য বিভাগে যেখানে মাত্র ৭,৮৭১ টাকা ১২ আনা খরচ হয়েছিল, সেখানে তাঁর রাজত্বকালের শেষ বছরে ১৯০৮-০৯ সালে স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় ছিল ৪২,১০৭ টাকা। এর মধ্যে শুধুমাত্র ডিসপেনসারি/হাসপাতালগুলিতে জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যয় ছিল ১২,৮২১ টাকা, আর চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যাও বেড়ে ৭০,৬৮৩ হয়। ১৯০৮-০৯ সালের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্র পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

রাধাকিশোরমাণিক্যের অন্যান্য অবদানগুলির মধ্যে পূর্ত বিভাগ দ্বারা রাস্তা, প্রাসাদ ও দেবালয় নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য পুরানো দীঘি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দীঘি নির্মাণ ইত্যাদি। ১৮৯৭ সালের ১২ জুন ভূমিকম্পে আগের রাজপ্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে গেলে মহারাজ আগরতলা শহরের জন্য একঝাঁক নির্মাণ কার্য শুরু করেন। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভি. এম. হাসপাতাল ও উমাকান্ত একাডেমির সুরম্য অট্টালিকা গৃহ, এছাড়া আরও কিছু

## ১৯০৮-০৯ খ্রিঃ বর্ষে রাজ্যের স্বাস্থ্য চিত্র

| ডিসপেনসারি/হাসপাতালের নাম | বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা | অন্তর্বিভাগে রোগীর সংখ্যা | ব্যয় (টাকা) | প্রতিদিনের উপস্থিতির গড় (নতুন+পুরনো) | অস্ত্রোপচার সংখ্যা | টীকাকরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. ভি. এম. হাসপাতাল | ২৬,১৩৯ | ৪১২ | ৬,৯৭৭ | ৮৬.৩৩ | ৩৫১ | ৫৭২ |
| ২. পুরাতন আগরতলা দাতব্য চিকিৎসালয় | ৫,৫২১ | ০ | ১৩৬ | ১৫.১০ | ২৭ | ৩৯ |
| ৩. বিশালগড় দাতব্য চিকিৎসালয় | ৫,১১৫ | ০ | ৫৯০ | ১৪.০১ | ১১ | ৩০৩ |
| ৪. সোনামুড়া দাতব্য চিকিৎসালয় | ৪,৩৪২ | ৩৫ | ৭৪০ | ১১.৮৯ | ১১২ | ৩৬২ |
| ৫. বিলোনীয়া দাতব্য চিকিৎসালয় | ৭,২০৪ | ২ | ৮১৮ | ১৯.৭০ | ১৩৫ | ২০৫ |
| ৬. লুংথুং দাতব্য চিকিৎসালয় | ১,৭১৪ | ০ | ৩৬৮ | ৪.৬০ | ৩৪ | ২৯৮ |
| ৭. কৈলাশহর দাতব্য চিকিৎসালয় | ৪,৫৭০ | ১২ | ৭৬২ | ১২.৮৪ | ১০২ | ২৭১ |
| ৮. কমলপুর দাতব্য চিকিৎসালয় | ২,৩০৯ | ২ | ৩৭২ | ৬.৩০ | ২৫ | ১৬০ |
| ৯. খোয়াই দাতব্য চিকিৎসালয় | ৫,৬৫৫ | ০ | ৬৩০ | ১৫.৪০ | ৮৪ | ২১৯ |
| ১০. ধর্মনগর দাতব্য চিকিৎসালয় | ৩,১৪৩ | ২৩ | ৫৭৮ | ৮.৬৬ | ৬ | ৪২ |
| ১১. উদয়পুর দাতব্য চিকিৎসালয় | ৩,৭৩০ | ৯ | ৬০০ | ১০.০৪ | ১৭ | ৬০০ |
| ১২. বীরগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয় | ৭৪৬ | ০ | ২৫০ | ২.০৪ | ৭ | ২৯৪ |
| মোট | ৭০,১৮৮ | ৪৯৫ | ১২,৮২১ | ২০৬.৯১ | ৯১১ | ৩,৩৬৫ |

** বহির্বিভাগে প্রদত্ত পরিসংখ্যান কেবলমাত্র প্রকৃত রোগীর সংখ্যা, কিন্তু ওই বছরে নতুন ও পুরাতন রোগী মিলিয়ে বহির্বিভাগে মোট উপস্থিতি ১,১৩,৫১৬ জন।

অফিস ভবন ও রাজপ্রাসাদ এলাকায় আরও কিছু পাকা ভবন নির্মিত হয়। একই সঙ্গে আখাউড়া খাল ও রাস্তা নির্মিত হয়। আগরতলা শহরের সেন্ট্রাল রোডটিও একই সময়ে নির্মিত হয়। এছাড়া রাধাসাগর দীঘিটি (বর্তমানের লক্ষ্মীনারায়ণ দীঘি) প্রাসাদ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই খনন করা হয়। এছাড়া বিলোনীয়া, সোনামুড়া, ধর্মনগর এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে অনেক দীঘি খনন করান। তাঁর আমলে জগন্নাথদেবের মন্দির, অভয়নগরের রাধামাধব মন্দির, বনমালীপুরের পাখাঙ্গাবা অর্থাৎ পাগলা দেবতার মন্দির, কুঞ্জবন সেনা নিবাসে শিব মন্দির, রাধানগর অঞ্চলে নরসিং আখড়া নির্মিত হয়।

তাঁর আমলে যোগাযোগের বেশ কিছু উন্নতি হয়। তাঁর রাজত্বের শুরুতে ৪৮ মাইল রাস্তা ছিল, রাজত্বের শেষে ত্রিপুরায় রাস্তার দৈর্ঘ্য ১২৫ মাইল। শুরুতে একটি মাত্র ডাকঘর ছিল, শেষে ১১টি ডাকঘর হয়, দুটি ডাকঘরে তার যোগ করা হয়। সোনামুড়াকে গোমতীর বন্যা এবং আগরতলাকে হাওড়া নদীর বন্যা থেকে বাঁচাতে মাটির বাঁধ, উদয়পুরের শস্যক্ষেত্র সুখসাগর জলাকে বাঁচাতে শালগড়ার কাছে গোমতীর বাঁক পরিবর্তন, কলকলিয়া-বামুটিয়া খাল নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জুমচাষই যে পার্বত্য প্রজাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায় সে বিষয়ে রাধাকিশোরমাণিক্যের স্পষ্ট ধারণা ছিল। এইজন্য তিনি রাজধানীর উপকণ্ঠে ১৮৯৭ সালে বীরেন্দ্রনগরে একটি আদর্শ কৃষিখামার প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে উপজাতিরা হাল চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষি ভিত্তিক আধুনিক জ্ঞান অর্জন করে। একই সঙ্গে যেসব পার্বত্য প্রজা জুম চাষ ছেড়ে হাল চাষে ইচ্ছুক, তাদের এককালীন সাহায্য হিসেবে ঋণ দেওয়ার জন্য মহারাজ রাজ্যে কিছু 'এগ্রিকালচারাল ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেন, যা ওই সময়ে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

এসব কিছুই পরবর্তীকালে ত্রিপুরার আধুনিকতায় উত্তরণে বিশাল ভূমিকা নিয়েছিল, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পার্বত্য প্রজাদের কল্যাণে। অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবনে আজীবন অভ্যস্ত মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের নিজের সম্পর্কে উপলব্ধি---'রাজভোগের অর্থ ভিক্ষালব্ধ প্রজাদের দানের পয়সা, কাজেই রাজাই বড় ভিক্ষুক'। এই মহৎ উপলব্ধির কারণেই তিনি প্রজাদের কাছে ছিলেন দায়বদ্ধ। এই কারণেই তাঁর পক্ষে এত অল্প সময়ে এতসব হিতকর কার্য সম্ভব হয়েছিল। এছাড়াও তিনি অন্যত্রও লোকহিতকর কর্মে সাহায্যের

হাত বাড়িয়েছিলেন। এদের অধিকাংশ দানই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। প্রকাশিত দানগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতন, বসু বিজ্ঞান মন্দির, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন অর্থ কষ্টে পড়ায় আজীবন মাসোহারা মহারাজের কাছ থেকে পেতেন। তাই সবদিক দিয়ে বিচারে ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন মহোত্তম।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলে রাজ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৪ থেকে শেষপর্যন্ত বেড়ে ১৭১ হয়, ছাত্রছাত্রী বেড়ে ৪৮০১ থেকে বেড়ে প্রায় ছয় হাজারকে (৫,৯৭২) স্পর্শ করে। স্কুলের সংখ্যা খুব একটা না বাড়লেও এই সময়ে স্কুলগুলির পরিকাঠামোর উন্নতি করা হয়, ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। পার্বত্য ছাত্রদের বৃত্তি সকল বিভাগেই সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। রাজধানীর হাইস্কুল ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের হাইস্কুলগুলিতে বোর্ডিং খোলা হয়েছিল। শিক্ষার আরও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকারি পরিচালনায় স্কুলগুলি ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাইভেট পাঠশালা খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় প্রশাসনকে অর্থাৎ বিদ্যালয় অঞ্চলের দারোগা, তহশীলদার বা নায়েব প্রভৃতিদের বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ওইসব বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছিল (তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

এই ১৭১টি স্কুলের মধ্যে ৫টি ছিল হাইস্কুল, ৫টি বালকদের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়, বালিকাদের ১টি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় (তুলসীবতী স্কুল), বালকদের জন্য একটি উচ্চ বাংলা বিদ্যালয়, বালকদের জন্য ২৩টি নিম্ন বাংলা বিদ্যালয়, ১১৫টি বালকদের পাঠশালা, ১১টি বালিকা পাঠশালা, ৬টি মাদ্রাসা, ৩টি সংস্কৃত টোল ও ১টি কারিগরি বিদ্যালয়।

যেখানে রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে ১৯০৮-০৯ সালে রাজ্যে শিক্ষা খাতে ব্যয় ছিল ৫৬,৯২৩ টাকা, সেখানে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলের শেষে তা দাঁড়ায় দ্বিগুণেরও বেশি অর্থাৎ ১,২৩,৮৬৩ টাকা। এর মধ্যে রাজকুমারদের জন্য শিক্ষা ব্যয় ৩১,০২৯ টাকা, ঠাকুর বোর্ডিং-এর ব্যয় ৮৪৭৮ টাকা ছাড়া বাকি সবটাই ছিল জনসাধারণের জন্য শিক্ষা খাতে ব্যয়।

অ্যাডমিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্টে ওই বছরের শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন খাতে ব্যয়

## ১৯২৩-২৪ খ্রিঃ বর্ষে রাজ্যের শিক্ষা চিত্র

| বিভাগ | বিদ্যালয়ের সংখ্যা | | | ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | | | জাতি | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | ঠাকুর | মণিপুরি | ত্রিপুরি | রিয়াং | কুকি | বাঙালি হিন্দু | বাঙালি মুসলমান | খ্রিস্টান | অন্যান্য |
| ১. সদর | ৪২ | ৩ | ৪৫ | ১৩৩৪ | ১৫০ | ১৪৮৪ | ১৬৫ | ১৭৬ | ১৩৮ | ২ | ২০ | ৬৭৬ | ২৮৩ | ৩ | ২১ |
| ২. কৈলাশহর | ১৭ | ২ | ১৯ | ৮৮৫ | ১২৬ | ১০১১ | ০ | ২৯৫ | ৫ | ৪ | ৬ | ৪৭৪ | ১৪৩ | ০ | ৮৪ |
| ৩. সোনামুড়া | ২১ | ১ | ২২ | ৭৯২ | ৬১ | ৮৫৩ | ০ | ০ | ৩৬ | ০ | ০ | ২২৮ | ৫৮৯ | ০ | ০ |
| ৪. বিলোনীয়া | ১৩ | ১ | ১৪ | ৬৬৮ | ২৭ | ৬৯৫ | ০ | ০ | ১৫ | ১৫ | ০ | ৪৬৬ | ১৯৯ | ০ | ০ |
| ৫. খোয়াই | ৯ | ১ | ১০ | ১৮৯ | ১৩ | ২০২ | ০ | ২০ | ৯৫ | ০ | ০ | ৫৮ | ১৫ | ০ | ১৪ |
| ৬. ধর্মনগর | ১৪ | ১ | ১৫ | ৫৪৬ | ৩৭ | ৫৮৩ | ০ | ১১৮ | ০ | ০ | ০ | ৩৭১ | ৯২ | ১ | ১ |
| ৭. উদয়পুর | ৫ | ১ | ৬ | ২০৯ | ১২ | ২২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১১৪ | ১০৭ | ০ | ০ |
| ৮. সাব্রুম | ৮ | ০ | ৮ | ১০৮ | ৮ | ১১৬ | ০ | ০ | ৪১ | ০ | ০ | ৫৬ | ১৯ | ০ | ০ |
| **উপবিভাগ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৯. অমরপুর | ৩ | ০ | ৩ | ৪৯ | ২ | ৫১ | ৩ | ০ | ১৬ | ২৭ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ১ |
| ১০. কল্যাণপুর | ৪ | ০ | ৪ | ৭১ | ০ | ৭১ | ০ | ৯ | ৬২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ১১. কমলপুর | ৬ | ১ | ৭ | ২৫৭ | ৩১ | ২৮৮ | ০ | ১৫৫ | ১২ | ০ | ০ | ৬৯ | ৩০ | ০ | ২২ |
| ১২. বিশালগড় | ১৭ | ১ | ১৮ | ৩৭৪ | ২৩ | ৩৯৭ | ১৩ | ২০ | ১১৩ | ০ | ০ | ৭১ | ১৮০ | ০ | ০ |
| মোট | ১৫৯ | ১২ | ১৭১ | ৫৪৮২ | ৪৯০ | ৫৯৭২ | ১৮১ | ৭৯৩ | ৫৩৩ | ৪৮ | ২৬ | ২৫৮৭ | ১৬৫৭ | ৪ | ১৪৩ |

* এছাড়া রাজ্যে ১৪টি প্রাইভেট স্কুল ছিল, যাতে আরও ৪৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ত।

নিম্নরূপ---

| বিভিন্ন খাত | ব্যয়িত অর্থ (টাকা) |
|---|---|
| ১। প্রাথমিক শিক্ষা | ২৯,৬০৫ |
| ২। মাধ্যমিক শিক্ষা | ৩৯,৪১৪ |
| ৩। বিশেষ প্রশিক্ষণের স্কুলসমূহ | ৩,৭২৩ |
| ৪। রাজকুমার ও রাজকুমারীদের শিক্ষা | ৩১,০২৯ |
| ৫। স্টাইপেন্ড ও স্কলারশিপ | ৫,৫৯৯ |
| ৬। ঠাকুর ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং স্কুল | ৮,৪৭৮ |
| ৭। লাইব্রেরি | ২,৩৫৫ |
| ৮। অন্যান্য | ১,০৬৭ |
| ৯। শস্য অ্যালাউন্স (Grain allowances) | ২,৫৯৩ |
| সর্বমোট- | ১,২৩,৮৬৩ |

এই ব্যয় রাজ্যের মোট আয়ের (১৫,৮২,০৩৫ টাকা) ৭.৮২ শতাংশ যা প্রশংসনীয়।

পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে প্রাথমিক শিক্ষায় যাতে তাদের সন্তানদের মধ্যে উৎসাহ জাগে, সেজন্য পার্বত্য ছাত্রদের জন্য এক বিশেষ পুরস্কার পরীক্ষার সূচনা ১৯১২-১৩ খ্রিঃ বর্ষ থেকে করা হয়। প্রতি বছর রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে ছাত্রদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হত এবং সফল ছাত্র ও তাদের শিক্ষকদের অর্থ পুরস্কার দেওয়া হত। উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য অসফল ছাত্রদেরও সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হত।

একই বর্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের সাহিত্য, গণিতের লিখিত পরীক্ষা এবং শিক্ষা দানের কৌশল ও শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদর্শনের প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা সমন্বিত বিভাগীয় বার্ষিক পরীক্ষা শিক্ষকদের উৎকর্ষ সাধনে চালু হয়, যা তাদের ইনক্রিমেন্ট ও প্রোমোশনের শর্ত হিসেবে আরোপিত হয়েছিল।

## ১৯২৩-২৪ খ্রিঃ বর্ষে রাজ্যের স্বাস্থ্য চিত্র

| ডিসপেনসারি/হাসপাতালের নাম | বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা | অন্তর্বিভাগে রোগীর সংখ্যা | ব্যয় (টাকা-আনা-পাই) | দৈনিক উপস্থিতির গড় | অস্ত্রোপচার সংখ্যা | টীকাকরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. ভি. এম. হাসপাতাল | ১১,৩১০ | ৩৯৬ | ৭,৪৫৬-৮-০ | ৬৯.৮ | ১১৬ | ৫৮৭ |
| ২. প্যালেস ডিসপেনসারি | ৬,১১৫ | ০ | ১১,৯১৫-১২-০ | ২৭.৬৮ | ০ | ০ |
| ৩. হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি | ১২,৩৩৩ | ০ | ৫,১৫৩-৫-৩ | ৫১.৮৩ | ০ | ০ |
| ৪. পুরাতন আগরতলা ডিসপেনসারি | ৬,৪৪৮ | ০ | ১,৫৯১-১৪-৬ | ৩৪.৫৪ | ৩২ | ৩৭৯ |
| ৫. বিশালগড় ডিসপেনসারি | ৩,০৬৩ | ০ | ৯৮০-১৩-৯ | ১২.৭১ | ৪১ | ৪৪১ |
| ৬. সোনামুড়া ডিসপেনসারি | ৭,৩৬৫ | ৪ | ১,২৪৮-৭-০ | ৩৫.৯১ | ৮৬ | ৩৩৭ |
| ৭. উদয়পুর ডিসপেনসারি | ৫,০০৪ | ৯ | ১,০৯০-৬-০ | ১৯.৩২ | ৭২ | ৩২২ |
| ৮. অমরপুর ডিসপেনসারি | ২,৬১২ | ০ | ৯৬৩-১-৯ | ৮.২১ | ২১ | ৫০৭ |
| ৯. বিলোনীয়া ডিসপেনসারি | ৪,১৭৯ | ০ | ১,১৭২-১৩-৯ | ১৮.৭৭ | ৬৫ | ৬৩৫ |
| ১০. লুংথুং ডিসপেনসারি | ১,৮৮২ | ০ | ৮৬৮-১০-৩ | ১৩.৪৫ | ৩৬ | ৪০৯ |

| ডিসপেনসারি/হাসপাতালের নাম | বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা | অন্তর্বিভাগে রোগীর সংখ্যা | ব্যয় (টাকা-আনা-পাই) | দৈনিক উপস্থিতির গড় | অস্ত্রোপচার সংখ্যা | টীকাকরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১. সাব্রুম ডিসপেনসারি | ১,৩৪৮ | ০ | ৮৪২-১০-৩ | ৫.৬৫ | ৮ | ১৪২ |
| ১২. খোয়াই ডিসপেনসারি | ৩,৮৯২ | ০ | ১,২৫৮-৪-৬ | ১৫.৬২ | ১৫১ | ৩৮৪ |
| ১৩. কল্যাণপুর ডিসপেনসারি | ১,২৬৫ | ০ | ৯২৭-১৫-৬ | ৫.৬৩ | ৯ | ৩০০ |
| ১৪. কৈলাশহর ডিসপেনসারি | ১১,৭৪০ | ৪ | ১৩১৩-১১-৯ | ৩৮.৭৯ | ১৭৭ | ১১৩ |
| ১৫. কমলপুর ডিসপেনসারি | ৪,০৭১ | ২ | ৯৯১-১২-০ | ১৪.৬৫ | ৫২ | ২৫৩ |
| ১৬. ধর্মনগর ডিসপেনসারি | ৩,৬৬৯ | ১৪ | ১,২০৯-১৫-০ | ১৮.৪৪ | ৭১ | ৪৭০ |
| ১৭. ফটিকরায় ডিসপেনসারি | ২,৬৯৩ | ০ | ১,০১০-৮-৩ | ১৪.২৯ | ৪৭ | ২৩১ |
| ১৮. বীরেন্দ্রনগর ডিসপেনসারি | ৯৫৪ | ০ | ৪৯৭-৬-৩ | ৪.৭৪ | ০ | ২৭ |
| ১৯. মোহনপুর ডিসপেনসারি | ২,৪৪২ | ০ | ৫০৪-৯-৬ | ১৪.৯৩ | ৫৯ | ২০০ |
| মোট | ৯২,৩৮৫ | ৪২৯ | ৪০,৯৯৮-৯-৩ | ৪২৪.৯৬ | ১,০৪৩ | ৫,৭৩৭ |

** বহির্বিভাগে প্রদত্ত পরিসংখ্যান কেবলমাত্র প্রকৃত রোগীর সংখ্যা, কিন্তু ওই বছরে নতুন ও পুরাতন রোগী মিলিয়ে বহির্বিভাগে মোট উপস্থিতি সংখ্যা ১,৪৯,২২৬।

কাশীপুরের রেশম শিল্পের কেন্দ্রটির আরও উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে মহারাজ ১৯০৯ সালে যোগেশ চৌধুরীকে জাপানে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান। তিনি প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এলে সেখানে একটি স্কুল খোলা হয়। ওই স্কুলের পাঠ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষি বিদ্যার উপরেই জোর দেওয়া হত।

বীরেন্দ্রকিশোর 'উডবার্ন আর্টিজান স্কুল' কারিগরি স্কুলটিকে আরও উন্নত করেন এবং তাঁত ও বাঁশের শিল্পকেও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন। গ্রামীণ এলাকা থেকে আগত শিক্ষার্থীরা শিক্ষান্তে নিজ নিজ গ্রামে স্বনিযুক্তির কাজে নিযুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেত।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলের শুরুতে ১২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও তা শেষে ১৯টিতে দাঁড়ায়। প্যালেস ডিসপেনসারির বহির্বিভাগটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। রাজধানীতে কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য আলাদা বিভাগ খোলা হয়। রাজধানীতে কালা জ্বরের প্রাদুর্ভাবে কালা জ্বরের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ করা হয়। বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের রাজত্বের শেষ বছর অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ খ্রিঃ বর্ষে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য চিত্র আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

রাজ্যে চিকিৎসকের অভাবে বিশেষত মফস্বল অঞ্চলের চিকিৎসালয়গুলিকে উপযুক্ত চিকিৎসকের যোগানে অসুবিধার কারণে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য তার সমাধানে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে 'Edward Memorial Medical Institution' নামে একটি মেডিক্যাল স্কুল চালু করেন, কিন্তু ব্রিটিশদের অসহযোগিতায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই তা বন্ধ করে দিতে হয়।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলে সোনামুড়া-উদয়পুর, আগরতলা-বিশালগড় সড়ক, বীরেন্দ্রনগর-উদয়পুর, সাব্রুম-আমলিঘাটের মত গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নির্মাণ কার্য শুরু হয়। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অফিসগৃহ, স্কুল বাড়ি, জেলখানা ইত্যাদির কাজ শেষ হয় অথবা চলতে থাকে। বিশালগড়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় হাওড়া নদীর উপর 'কারমাইকেল ব্রিজ' নামে একটি সেতু ও রোনাল্ডসে রোড নির্মিত হয়। আগরতলায় লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি ও দুর্গাবাড়ি, উমাকান্ত একাডেমির পশ্চিমে মন্ত্রী অফিস (মহাকরণ), কুঞ্জবনে পুষ্পবন্ত প্রাসাদ তাঁর প্রধান কীর্তি। এছাড়া বীরেন্দ্রকিশোর পত্নী প্রভাবতী দেবীর গোলবাজারের নিকটস্থ শিববাড়ি উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের অনেক স্থানেও দীঘি খনন করা হয়।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলেই ত্রিপুরায় ভূতাত্ত্বিক সার্ভে ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য ভূতত্ত্ববিদ অশোক বসুকে নিযুক্ত করা হয়। এই রিপোর্টে খনিজ দ্রব্য ছাড়া অর্থকরী ফসল নিয়ে আলোচনা আছে। কিন্তু এই ভূতত্ত্ববিদের আকস্মিক মৃত্যুতে কোনও ফলপ্রদ পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। এরপর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বার্মা অয়েল কোম্পানিকে তেল অনুসন্ধানের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়।

ত্রিপুরায় চা-শিল্পের পথিকৃৎ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য। বিশেষজ্ঞ ড. এ. সি. ভট্টাচার্যের রাজ্যে চা-শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুকূল রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৭ সালে চা বাগান বিষয়ক আইন প্রণীত হয় এবং এরপর থেকে সরকারি নিয়মে চা বাগান গড়ে উঠতে থাকে।

ভূমি ক্ষয় ও বন্যার হাত থেকে বাঁচতে হাওড়া ও খোয়াই নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কাজ তাঁর আমলেই শুরু হয়। এছাড়া লোকহিতার্থে ত্রিপুরার বাইরেও তিনি নিজ তহবিল থেকেই অনেক দান করতেন, যার মধ্যে সরলা দেবীর 'সখী সমিতি', লেডি চেমস ফোর্ডের শিশু ও নারী সেবার সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, শান্তিনিকেতন উল্লেখযোগ্য।

তাই সর্বশেষ বলা যায় যে, আধুনিক ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের ভূমিকা কম নয়।

১৯২৩ সালের ১৩ আগস্ট বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের মৃত্যু হলে বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য রাজা হলেও বয়সে নাবালক হওয়ায় শাসন পরিষদ গঠিত হয়। চার বৎসর তাঁদের দ্বারা রাজ্য পরিচালিত হওয়ার পর ১৯২৭ সালের ১৯ আগস্ট মহারাজের রাজ্যাভিষেক হয়।

প্রথমে শাসন পরিষদের পরিচালনাকালে বাজেট সঙ্কোচন নীতিতে যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের নির্ধারিত মানকে অতিক্রম করতে পারবে না, তাদের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে পরের বছরই (১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দ) সরকারি স্কুলের সংখ্যা ১৭১ থেকে ১৩৮-এ নেমে যায়। অপরপক্ষে এর জন্য প্রাইভেট স্কুল সংখ্যা বেড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সরকারি স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ১৯৩০-৩১ খ্রিঃ বর্ষে সর্বোচ্চ ২২০-এ পৌঁছালেও পরে তা আবার কমতে থাকে। কিন্তু এরজন্য ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কখনও কমে যায়নি, বরং তা বছর বছর বেড়ে চলেছিল।

বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের ১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ বর্ষ পর্যন্ত অ্যাডমিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্ট পাওয়া গেছে, শেষ দুই বছরের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, বিভাগ মাফিক শিক্ষার চিত্র মাত্র ১৯২৬-২৭ খ্রিঃ বর্ষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে শিক্ষাচিত্রের পরিসংখ্যান খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই শিক্ষার পরিপূর্ণ চিত্রটি এখানে তুলে ধরা যাবে না। ১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ বর্ষের রিপোর্টে দেখা যায় যে ওই বছরের শেষে ১৫৬টি সরকারি স্কুল ও ৫১টি প্রাইভেট স্কুল ছিল এবং সরকারী স্কুলে সবমিলিয়ে ১০,০০১ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। এর মধ্যে ৮টি হাইস্কুল (৭টি ছেলেদের, ১টি মেয়েদের); ২২টি মধ্য ইংরেজি স্কুল (১৬টি ছেলেদের, ৬টি মেয়েদের); ২৮টি নিম্ন বাংলা স্কুল (২৩টি ছেলেদের, ৫টি মেয়েদের); ৮৬টি ছেলেদের প্রাইমারি স্কুল; ৪টি বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল; ৪টি সংস্কৃত টোল; ৫টি মাদ্রাসা এবং একটি জেল অপরাধীদের জন্য স্কুল (কারিগরি স্কুলটি থাকলেও তা শিক্ষা বিভাগের হাত থেকে নিয়ে 'Demobilised Personal Committee'-কে ভার দেওয়া হয়েছে) সরকারি স্কুলের অন্তর্ভুক্ত। আগের রিপোর্টগুলির ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, বেসরকারি স্কুলগুলিতে কমপক্ষে ১,৫০০ ছাত্র ছিল। তাই ঐ বছরে রাজ্যে সর্বমোট ২০৭টি স্কুলে অন্যূন ১১,৫০০ ছাত্রছাত্রী ছিল বলে অনুমান করা যায়। স্কুলগুলির জন্য কত ব্যয় হয়েছিল তা জানা না গেলেও ওই বৎসরে শিক্ষা বিভাগের ব্যয় ১,৯৩,০৯৭ টাকা ছিল বলে জানা যায়।

পার্বত্য ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে উমাকান্ত একাডেমিতে এবং খোয়াই স্কুলে বোর্ডিং খোলা হয়। কল্যাণপুরে তাদের জন্য 'রামকুমার বোর্ডিং স্কুল' নামে একটি স্কুল খোলা হয়। লুসাইদের জন্য বিশেষ স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা হয়।

স্কুলগুলির পরিচালনায় উন্নতি আনতে প্রতিটি স্কুলে স্থানীয়দের নিয়ে 'এডুকেশন কমিটি' গঠন করা হয়। আগরতলায় ম্যাট্রিক পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আগরতলার সেন্ট্রাল জেলের কয়েদি এবং সৈনিক ব্যারাকের অশিক্ষিত সৈন্যদের জন্য পাঠশালা চালু করা হয়। শ্রমিক শ্রেণি ও ব্যবসায়ীদের জন্য 'নাইট স্কুল' আগরতলায় খোলা হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের সর্বপ্রধান অবদান হচ্ছে ১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ বর্ষে আগরতলার মিউনিসিপালিটি অঞ্চলে উমাকান্ত

একাডেমি, মহারানী তুলসীবতী স্কুল, বিজয় কুমার স্কুল ও ঠাকুরপল্লী স্কুলে (বর্তমানের বোধজং স্কুল) সকালবেলায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, যাতে বালক ও বালিকা উভয়েই পড়ত। পরবর্তী সময়ে তা হাওড়া নদীর অববাহিকা অঞ্চলে মফস্বলেও বর্ধিত করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের সবচেয়ে বড় ও প্রিয় পরিকল্পনা ছিল 'বিদ্যাপত্তন'। ১৯৩৭ সালে তিনি এর পরিকল্পনার একটি নকশা পেশ করেন ও মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন। এই পরিকল্পনায় শুধুমাত্র এই মহাবিদ্যালয় বা কলেজটিই ছিল না, একে ঘিরে একটি হাইস্কুল, একটি কারিগরি বিদ্যালয়, একটি শারীর শিক্ষা বিদ্যালয়, একটি চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিদ্যালয়, একটি সংগীত ও নৃত্যের স্কুল, একটি মেয়েদের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়, একটি কৃষি ও গৃহপালিত পশু-পাখি পালন বিদ্যালয়, একটি পাবলিক লাইব্রেরি, একটি মেডিক্যাল স্কুল, একটি হাসপাতাল এবং একটি নাট্যশালাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণেরও পরিকল্পনা ছিল। কলেজ টিলা অঞ্চলের ২৩৪ একর জায়গা জুড়ে এই সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞের সূচনার পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ত্রিপুরা জড়িয়ে পড়ায় কাজ বন্ধ থাকে এবং এরপর মহারাজের অকালমৃত্যু ঘটে। ফলে পরে কেবলমাত্র কলেজটির নির্মাণ কার্য শেষ করে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কলেজটি চালু করা হয়।

আমরা আগেই বলেছি, ১৩৪৬ ত্রিং (১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দ) সনের পর জাতি অনুসারে বিভাগীয় শিক্ষা চিত্রের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। ১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ সালে অবাঙালি ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে রাজকুমার-২ জন, ঠাকুর-২৮৩ জন, মণিপুরি-৮৫৬ জন, ত্রিপুরি-৯৭৩ জন, কুকি-৪ জন; লুসাই-১৯ জন এবং অন্যান্য-৮৬ জন দেখা যায়।

মহারাজের মৃত্যুর পর কিরীটবিক্রম কিশোর নাবালক থাকায় শাসন ক্ষমতা মহারানীর নেতৃত্বে শাসন পরিষদের হাতে যায়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর ভাষণে রাজ্যে একটি মহিলাদের হাইস্কুল সহ ৯টি হাইস্কুল, ২৫টি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় ও ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। এর মধ্যে প্রাইভেট স্কুলগুলিও অন্তর্ভুক্ত কি না, তা জানা যায় না।

বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের আমলের শেষ ভাগে ১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ বর্ষে রাজ্যে ২১টি ডিসপেনসারি চালু থাকে। বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের রাজত্বের শেষভাগে রাজ্যের ১৯টি ডিসপেনসারির যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে মোহনপুরের ডিসপেনসারিটি পরে তুলে দেওয়া হয়। লুংথুং ডিসপেনসারিটি নতুন নামে মুহুরীপুর ডিসপেনসারি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, বীরেন্দ্রনগর ডিসপেনসারিটি সেখান থেকে ধলেশ্বরে 'ধলেশ্বর ডিসপেনসারি' হিসেবে চালু হয়। নতুন ডিসপেনসারি হিসেবে কুঞ্জবনের সৈনিক ব্যারাকের ডিসপেনসারি এবং এই প্রথম দুটি অপেক্ষাকৃত দুর্গম স্থানে কুলাই হাওর ও ডম্বুরনগরে (নূতনবাজার) ডিসপেনসারি চালু করা হয়।

এই ডিসপেনসারিগুলিতে রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে ১৯৪১-৪২ খ্রিঃ বর্ষে সর্বোচ্চে পৌঁছায়। ওই বছরে বহির্বিভাগে নতুন রোগীর সংখ্যা ১,৬৭,৬৩৩ হয় এবং নতুন ও পুরাতন রোগী মিলিয়ে উপস্থিতির সংখ্যা ৩,১৯,০৯১-এ দাঁড়ায়, অপরপক্ষে বিভিন্ন ডিসপেনসারি/হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে মোট রোগীর সংখ্যা ছিল ১,৬৫৮। অবশ্য পরবর্তী বছরগুলিতে রোগীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে এবং ১৯৪৫-৪৬ সনে সমগ্র রাজ্যে বহির্বিভাগে নতুন রোগীর সংখ্যা ৭২,৪৩৩ এবং নতুন-পুরাতন মিলিয়ে রোগীর বহির্বিভাগে মোট উপস্থিত সংখ্যা ১,৯২,৫০১ (দৈনিক উপস্থিতি ১৯৬.৩৮) হয়। অন্তর্বিভাগে মোট রোগীর সংখ্যা ৭৫২ (দৈনিক গড় ২.০৬) ছিল।

রোগীর সংখ্যার এই বৃদ্ধি হাসপাতাল/ডিসপেনসারিগুলির কর্মক্ষমতা যে এই আমলে বৃদ্ধি করা হয়েছিল, তারই ইঙ্গিত দেয়। ভি. এম. হাসপাতালে এক্স-রে ইউনিট, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ক্লিনিক, কালাজ্বরের ইউনিট, জরুরি অস্ত্রোপচার কক্ষ ইত্যাদির সংযোজনের মাধ্যমে হাসপাতালটিকে একটি আধুনিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। এছাড়া ভি. এম. হাসপাতালে ও খোয়াইয়ে কুষ্ঠ রোগের দুটি ক্লিনিক খোলা হয়। রাজ্যে যক্ষা রোগের একটি স্যানাটোরিয়াম খোলার প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা চালু করা যায়নি।

রাজ্যের পূর্ত বিভাগের দ্বারা ওই সময়ে রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মিত হয়। এছাড়া খাস আদালত ভবন, নীরমহল, জ্যাকসন গেইট ইত্যাদি নানা নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। আগরতলা শহরে পরিকল্পিত উপায়ে নানা রাস্তা

নির্মাণ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পার্ক নির্মাণ ও সুরম্য ভবন নির্মাণের মাধ্যমে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। পরিকল্পিত উপায়ে শহরে রামনগর এলাকা গড়ে উঠে। সেন্ট্রাল রোডের শেষ প্রান্তে গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণে গোলাকৃতি ইমারত নির্মাণের মাধ্যমে মহারাজগঞ্জ বাজার (গোলবাজার) গড়ে উঠে। কুঞ্জবনে 'মালঞ্চ নিবাস' গড়ে উঠে। বেণুবন বিহার ও উমা-মহেশ্বর মন্দির তাঁরই কীর্তি।

পার্বত্য প্রজারা যাতে জুম চাষ পরিত্যাগ করে লাঙ্গল চাষে অভ্যস্ত হতে পারে সেজন্য প্রথমে কল্যাণপুরে ১১,০০০ দ্রোণ ও পরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ১৯৫০ বর্গমাইল বা ১,৯৫,০০০ দ্রোণ সমতল কৃষিজমি তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। দাঙ্গাপীড়িত পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের মহারাজ কেবল আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থাই শুধু করেননি, তাদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্যের পতিত জমি উদ্ধার করে একটি দফতরও চালু করেন।

তাঁর আমলে রাজ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়, ১৯৩৫ সালে ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক চালু হয়, সিনেমা হল চালু হয়, প্রথম পিচ রাস্তা হয়, প্রথম ভূতত্ব বিভাগ গড়ে উঠে, 'ম্যাচ ফ্যাক্টরি' গড়ে উঠে, আগরতলায় বিমানবন্দর গড়ে উঠে। বিভিন্ন বিভাগে 'উন্নয়ন সমিতি' গঠন করা হয়।

কাজেই এক কথায় বলা যায়, রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি প্রতিটি বিভাগে বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের তীক্ষ্ণ নজর ছিল এবং তাঁরই হাত ধরে আধুনিক ত্রিপুরার জন্ম হয়।

# ৪ স্থাপত্য শিল্প

ত্রিপুরায় স্থাপত্য শিল্পের উদাহরণ খুব একটা বেশি নেই। প্রস্তর নির্মিত মন্দির-শিল্প ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতির পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই মধ্যযুগ অথবা আধুনিক যুগে স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম প্রধান নিদর্শন যে মন্দির-শিল্প আমরা ত্রিপুরাতে দেখতে পাই তার সবগুলিই ইট দিয়ে তৈরি।

মধ্যযুগে নির্মিত রাজধানী উদয়পুরের মন্দিরগুলির সবগুলিই বাংলার চারচালা রীতিতে নির্মিত। তবে এর সঙ্গে বৌদ্ধ স্তূপশীর্ষের সংযোজন ত্রিপুরার মন্দির-শিল্পকে এক পৃথক রীতিতে উত্তীর্ণ করেছে। বাংলার কুটীরের মতোই মন্দিরের চার কোণে চারটি পালা বা খুঁটি আছে। খুঁটিগুলির গাঁটগুলিকেও স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। দেওয়ালগুলিতে বাঁশের বেড়ার খাপের মতোই ভূমির সমান্তরালে কতকগুলি বর্ধিত রেখা টানা হয়েছে। চারচালার উপরে স্তূপশীর্ষের আকারে আমলক এবং তার উপরে কলস ও পতাকায় ত্রিপুরার এই মন্দির-শিল্প সারা ভারতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছে।

মন্দিরের চার কোণে অবস্থিত খুঁটিগুলির গোলাকার গড়ন নিচ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হওয়ায় একে অনেকটা মুসলিম রীতির মিনারের দ্বারা প্রভাবিত বলে অনেকে মনে করেন। তবে ইসলামিক মিনারের চূড়া এখানে অনুপস্থিত, এই খুঁটিগুলির শীর্ষে একটি কলস ও তার উপরে চার চালার অবস্থান এতে হিন্দু রীতিরই প্রতিফলন দেখা যায়।

উদয়পুরে বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজাদের দ্বারা যে সকল মন্দির নির্মিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই আজ পরিত্যক্ত অব্যবহার্য হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার দিন গুণছে। এদের শীঘ্রই রক্ষণাবেক্ষণ না করলে এই অমূল্য সম্পদগুলি চিরতরে হারিয়ে যাবে। এদের মধ্যে অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দির ও শিব মন্দিরটি বহুল ব্যবহৃত তীর্থস্থান হওয়ায় ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আবার এই দুটি মন্দিরই উদয়পুরের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির।

**১) ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দির :-**

ত্রিপুরা রাজ্যের এই মন্দিরটি পীঠস্থান বলে পরিগণিত। উদয়পুর থেকে

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে মাতাবাড়ি অঞ্চলে একটি অনুচ্চ টিলায় এটি অবস্থিত। মন্দিরটি ধন্যমাণিক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। রাজমালায় বলা হয়েছে যে, একটি বিষ্ণু মন্দির নির্মাণের পর আরেকটি বিষ্ণু মন্দির নির্মাণের আরম্ভেই তিনি স্বপ্নে এই মন্দিরে এই কালিকা দেবীকে প্রতিষ্ঠার আদেশ পান—

ভগবতি স্বপ্ন তাকে কহে নিসাকালে।

এহি মঠে আমাকে স্তাপহ মহিপালে।।

চাটীগ্রামের চাটেস্বরি তাহার নিকটে।

সিলামুর্ত্তি আছি আমি বড়হি সঙ্কটে।।

আনিয়া আমাকে পুজ এহি মঠ মাজে।

এরপরই ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম থেকে এই দেবীমূর্তি এনে মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন করার পর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রসাঙ্গামর্দ্দননারায়ণ নৃপতি আজ্ঞাতে।

স্বপ্নে কহিছে জথা মিলিল তথাতে।।

সেই স্থান হতে জগন্মহিকে আনিল।

নিকটেত জাইয়া রাজা প্রণাম করিল।।

প্রস্তুত হইল মঠ দেখিলেক জবে।

পুণ্যদিনে কালি সম্প্রদান কৈল তবে।।

ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম প্রথম আক্রমণ করেন ১৪৩৫ শকে, তখন গৌড়ের সৈন্যদের ত্রিপুরা আক্রমণকে প্রতিহত করতে তাকে চট্টগ্রাম থেকে পিছু হটতে হয়। এরপর আবার তিনি ১৪৩৬ শকেই চট্টগ্রাম দখল করেন, অবশ্য তাঁর দ্বিতীয়বার চট্টগ্রাম বিজয়ও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, আবার নবাব সৈন্যরা ত্রিপুরা আক্রমণ করে। যাই হউক, চট্টগ্রাম থেকে মূর্তি আনতে গেলে ধন্যমাণিক্যকে ওই সময়ের মধ্যেই তা আনতে হবে। এরপর মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর তাতে দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব। রাজমালায় মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠার সময় দেওয়া হয়েছে ১৪৪২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ। সেক্ষেত্রে মন্দির নির্মাণে ছয় বৎসর লাগা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু ধন্যমাণিক্যের এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ের শিলালিপিটি মন্দিরগাত্রে পাওয়া যায়নি। ১৬০৩ শকে মন্দির সংস্কারের সময় রামমাণিক্য যে শিলালিপিটি মন্দির গাত্রে লাগিয়েছিলেন, তার পাঠোদ্ধার করে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, ১৪২৩ শকে ধন্যমাণিক্য এই মন্দির অম্বিকা দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। কাজেই এক্ষেত্রে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী রাজমালার মতেরই অনুসারী। অন্যান্যরাও এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করতে সক্ষম হননি।

শিলালিপিতে প্রতিষ্ঠাকালের বর্ণনায় 'শাকে বহ্ন্যক্ষি বেধোমুখধরণীযুতে' (বহ্নি=৩; অক্ষি=২, বেধোমুখ=৪, ধরণী=১ অর্থাৎ অঙ্কস্য বামগতি রীতি অনুসারে, শক ১৪২৩) অংশে অক্ষিকে সকল বিশেষজ্ঞরাই ২ ধরেছেন, কিন্তু শিলালিপির দ্বিতীয়াংশে রামমাণিক্যের সংস্কারকালের বর্ণনায় 'শাকে নেত্রবিয়সেন্দুমিলিতে' অংশে (নেত্র=৩, বিয়ৎ=০; রস=৬, ইন্দু=১ অর্থাৎ অঙ্কস্য বামগতি অনুসারে শক ১৬০৩) একই শব্দ অর্থাৎ 'নেত্র'-কে ৩ ধরা হয়েছে।

কোন সংস্কৃত-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে একই শিলালিপি রচনায় একই শব্দের দুই ধরনের আঙ্কিক প্রকাশ অসম্ভব। 'নেত্র' শব্দটির আঙ্কিক অর্থ যে '৩' তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে সংস্কার কার্যের সময় প্রকাশে শিলালিপির সর্বশেষে সময়কালের আঙ্কিক প্রকাশে (শকাব্দা ১৬০৩)। তাই প্রথম শিলালিপির প্রতিষ্ঠাকালের 'অক্ষি'-ও অবশ্যই '৩' হওয়ার কথা। এই অর্থে মন্দিরের দেবীকে সংকল্প করে নির্মাণারম্ভের কাল ১৪৩৩ শকাব্দ হতে পারে, যা রাজমালার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কিন্তু মন্দিরের গাত্রে একই সময়ের আরেকটি শিলালিপিতে প্রতিষ্ঠাকাল ১৪২৩ শকাব্দ বলে উল্লেখ আছে। এর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, এই শিলালিপিটি নিতান্তই কোনও ব্যক্তিগত প্রয়াস, খুব সম্ভবত এটি রামমাণিক্যের শ্যালক বলিভীমের দ্বারাই পরবর্তী সময়ে সংযোজিত। বর্তমানকালের বিশেষজ্ঞরা শিলালিপি পাঠে যে ভুল করেছেন, বলিভীমও সেই একই ভুল করেছিলেন।

মন্দিরটি পূর্বে বর্ণিত বিশিষ্ট ত্রিপুরা রীতিতে গড়া, তবে এর চূড়াটি সামান্য আলাদা। রাজমালায় বলা হয়েছে যে, অমরমাণিক্যের আমলে মগদের আক্রমণের সময় মন্দিরের চূড়াটি মগরা ক্ষতিগ্রস্ত করে, পরবর্তীকালে কল্যাণমাণিক্য একে নতুন করে নির্মাণ করেন।

মন্দিরের দ্বার পশ্চিমমুখী। মন্দিরে 'ত্রিপুরসুন্দরী' নাম্না প্রস্তর নির্মিত চতুর্ভুজা কালিকা মূর্তি ছাড়াও তাঁর পাশে প্রস্তর নির্মিত ছোট আকারের আরেকটি চতুর্ভুজা শক্তিমূর্তি আছে। একে সাধারণ্যে 'ছোটমা' বলা হয় এবং চণ্ডীরূপে ইনি পূজিত হন। অবশ্য সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা তাঁর 'ত্রিপুরার স্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন—'সর্ব্বসাধারণে ইহাকেই প্রকৃত ত্রিপুরাসুন্দরী বলিয়া নির্দ্দেশ করে।'

**২) মহাদেববাড়ি :-**

উদয়পুরের দেবতাপাড়ায় মহাদেববাড়ি মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীরবদ্ধ এলাকায় একসঙ্গে তিনটি মন্দির দেখা যায়। এতে প্রবেশ করতে হলে একটি দোচালা বিশিষ্ট সিংহদ্বার পেরুতে হয়। এতে সংলগ্ন প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় যে, কল্যাণমাণিক্যই এই প্রাচীরটি নির্মাণ করেন। শ্রীরাজমালায় বলা হয়েছে—

সিংহদ্বার সমীপেতে মনোরম স্থান।
ইষ্টক পাষাণে মঠ করিছে নির্ম্মাণ।।

এই সিংহদ্বার পেরিয়েই একেবারে পূর্ব্বদিকের পশ্চিম দুয়ারী মন্দিরটিই ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর ভৈরব ত্রিপুরেশ শিবের মন্দির। এই মন্দিরেরও মূল প্রতিষ্ঠা শিলালিপিটি পাওয়া যায়নি। মন্দির গাত্রে যে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে, তা কল্যাণমাণিক্যের আমলের। এ থেকে জানা যায় যে, ধন্যমাণিক্য নির্মিত মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় কল্যাণমাণিক্য বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে ১৫৭৩ শকাব্দে ভগবান শঙ্করকে উৎসর্গ করেন। সেই অর্থে ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দিরের মত এই মন্দির তত পুরানো নয়। মন্দিরের সামনে টিনের চালাবিশিষ্ট একটি নাট মন্দির আছে। মন্দিরের ভিতরে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের বৃহৎ শিবলিঙ্গ বর্তমান। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে মন্দির চত্বরে শিব-চতুর্দশী মেলা শুরু হয়। বর্তমানে এই মেলা তার জৌলুষ হারিয়েছে।

**৩) গোপীনাথ মন্দির :-**

দেবতাপাড়ার সবচেয়ে বড় মন্দিরটি হচ্ছে গোপীনাথ মন্দির। সিংহদ্বার পেরিয়ে সোজা সামনে নাটমন্দির সহ দক্ষিণদুয়ারী মন্দিরটিই গোপীনাথ মন্দির। নাট মন্দিরের কোনও ছাদ নেই। এই নাট মন্দিরটিকেই রাজমালায় জগতমোহন বলা হয়েছে। রাজমালায় মন্দির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ইষ্টক পাসানে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া।
উৎসর্গ করিল রাজা বিষ্ণু উদ্ধেসিয়া।।
চন্দ্রগোপীনাথ মুর্ত্তি চাটীগ্রামে ছিল।
অমর মাণিক্যকালে মঘে নিয়াছিল।।
বহু জত্নে সেই মুর্ত্তি আনিয়া রাজন।
সেই মঠে গোপীনাথ করিল স্থাপন।।
... ... ...
... ... ...
তবে রাজা মঠের সম্মুখে ততক্ষণ।
নির্ম্মাণ করিল গৃহ জগতমোহণ।।

মন্দিরগাত্রের শিলালিপিতে জানা যায় যে, ১৫৭২ শকাব্দে এই মন্দিরটি কল্যাণমাণিক্য দ্বারা নির্মিত হয়ে তার মধ্যে গোপীনাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে মন্দিরে কোনও মূর্তি নাই।

মন্দির-মধ্যে গোপীনাথ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও জনসাধারণের কাছে তা চতুর্দশ দেবতার মন্দির বলে পরে কথিত ছিল। কিন্তু কোনও স্পষ্ট কারণ জানা যায়নি। রাজমালাও এ বিষয়ে নিরুত্তর। শ্রীরাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় এ বিষয়ে ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দিরের উদাহরণ টেনে এর ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তা খুব একটা প্রত্যয় উৎপাদন করে না।

**৪) রামদেবের বিষ্ণুমন্দির :-**

মহাদেববাড়ি অঞ্চলের তৃতীয় মন্দিরটি গোপীনাথ মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৫৯৫ শকাব্দে (১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে) গোবিন্দমাণিক্যপুত্র যুবরাজ রামদেব এই মন্দিরটি নির্মাণ করে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। প্রকৃতপক্ষে, রামদেব ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ একে মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের লক্ষ্মীনারায়ণ অথবা বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির বলে মনে করে। মুকুন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৭২৯-৩৯ খ্রিস্টাব্দ।

এ বিষয়ে শ্রীরাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনের চতুর্থ লহরের মধ্যমণিতে দুই জায়গায় দুই ধরনের ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী। রামমাণিক্যের আলোচনায় আলোচ্য মন্দিরটিকে তিনি রামমাণিক্যেরই প্রতিষ্ঠিত বলে মেনেছেন (শিলালিপি অনুসারে)। অথচ পরবর্তী সময়ে মুকুন্দ মাণিক্যের আলোচনায় শিলালিপিকে অস্পষ্ট ধরে তাকে মুকুন্দ মাণিক্যের নির্মিত বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির বলে মেনে নিয়েছেন। সম্ভবত কালীপ্রসন্ন সেন জনশ্রুতিকে মান্যতা দিতে গিয়েই এই পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের শিকার হয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এই বৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্তি কৃষ্ণমাণিক্য আগরতলায় রাজধানী করার সময় উদয়পুর থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তবে কি মুকুন্দমাণিক্য রামমাণিক্যের এই বিষ্ণু মন্দিরেই বৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন?

**৫) জগন্নাথের দোল :-**

উদয়পুরের পুরাতন দীঘি বা জগন্নাথ দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ত্রিপুরার একমাত্র প্রস্তর নির্মিত মন্দিরটি অবস্থিত। একে জনসাধারণ 'জগন্নাথের দোল' বলে থাকে। কালো শ্লেট পাথরের এই মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত, ভূমিকম্পে মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পর তার আর সংস্কার হয়নি। গাছপালা ক্রমশ মন্দিরটিকে গ্রাস করছে। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত তাঁর 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থে লিখেছেন—'উক্ত স্থান হইতে জগন্নাথ বিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়া কুমিল্লার জগন্নাথ বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছে। ... কুমিল্লা সহরের সন্নিহিত জগন্নাথ বাড়ীর পাণ্ডার তত্বাবধানে অধুনা উদয়পুরস্থিত জগন্নাথ বাড়ীতে নূতন জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে।' দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী লিখেছেন—'বস্তুতঃ মন্দিরের সামনে একটি ছনবাঁশের তৈরী কুঁড়ে ঘরে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার মূর্ত্তি পূজা হয়ে থাকে রীতিমত।'

সাধারণ্যে এই ধারণা কেমন করে এলো, তা সঠিক বলা সম্ভব নয়, কিন্তু মন্দিরের শিলালিপি এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত করে। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মাতার মৃত্যুর পর পিতা কল্যাণমাণিক্যের আজ্ঞানুসারে গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁর অনুজ জগন্নাথদেব মাতা সহরবতীর স্বর্গকামনায় ১৫৮৩ শকাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এই মন্দির উৎসর্গ করেন।

**৬) হরি মন্দির :-**

জগন্নাথ দীঘির পূর্ব তীরে অবস্থিত তোরণ সহযোগে স্তূপ-শীর্ষ চারচালা

ত্রিপুরা রীতিতে নির্মিত একটি মন্দিরকে জনসাধারণ হরিমন্দির বলে থাকে। মন্দিরটি যথেষ্ট প্রাচীন হলেও শিলালিপির স্থান খালি থাকায় মন্দিরটি কখন নির্মিত হয়েছিল অথবা কার দ্বারা তৈরি হয়েছিল, তা জানা যায়নি। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন যে, ১৩১১ ত্রিং সনে (অর্থাৎ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) এই মন্দিরের আবর্জনা পরিষ্কার করে মন্দিরে শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের ছবি স্থাপন করে একে 'হরিমন্দির' রূপে চালু করা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বারদীর ব্রহ্মচারীর শিষ্য বরদাকান্ত নাগ একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য উদয়পুরে এসেছিলেন। হরিমন্দিরে রক্ষিত রাধাকৃষ্ণের ছবি ও কিছু জিনিস তিনিই দিয়ে যান। এভাবে কিছুদিন ব্যবহৃত হওয়ার পর মন্দিরটি আবার পরিত্যক্ত হয়। এরপর প্রসন্নকুমার দে নামক এক ব্যক্তি মন্দিরে আবার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশধরেরা এখনও পূজার্চনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের প্রচেষ্টাতেই প্রতি বৎসর এখানে বাসন্তী পূজা হয় বলে পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

মন্দিরটিকে ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী ধন্যমাণিক্যের দ্বিতীয় বিষ্ণুমন্দির হিসেবে সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন।

**৭) গুঙিচা বাড়ি :-**

জগন্নাথ দীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে নদীর দিকে ঝুঁকে থাকা একটি মন্দিরের বিবরণ ড. দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী দিয়েছেন এবং অচিরেই তা বিলুপ্ত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মন্দিরটির সামনে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে আছে। মন্দিরটির শিলালিপি পাওয়া যায়নি, তাই এটি কোন্ সময়ে অথবা কার দ্বারা নির্মিত তা জানা যায় না। তবে শ্রীরাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন একে দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের দ্বারা নির্মিত হয় বলে মনে করেন।

**৮) গুণবতী মন্দির :-**

মহাদেববাড়ি থেকে বদরমোকামের দিকে কিছু দূর গেলে রাস্তার বাম পাশে তিনটি মন্দির পাশাপাশি দেখা যায়। এই মন্দিরগুলির মধ্যে পশ্চিমদিকের পূর্ব মুখী মন্দিরটির শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই মন্দিরটি গোবিন্দমাণিক্য পত্নী গুণবতী দ্বারা ১৫৯০ শকাব্দের বৈশাখ মাসের যুগাদ্যা দিবসে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। বাকি দুটি মন্দিরের একটি পশ্চিম দুয়ারী

এবং অপরটি দক্ষিণ দুয়ারী। কিন্তু মন্দির দুটিতে শিলালিপি পাওয়া যায়নি, তাই এরা কার দ্বারা কখন নির্মিত তা জানা যায়নি। তবে এই দুটি মন্দিরও গুণবতী দেবী দ্বারা নির্মিত বলে সাধারণ্যে বিশ্বাস। ড. জগদীশ গণচৌধুরী এই তিনটি মন্দির গুণবতী দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে উৎসর্গ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তথ্যের উৎস উল্লেখ করেননি।

**৯) দুত্যার বাড়ি :-**

মহাদেববাড়ি অঞ্চলে তিনটি মন্দিরের পূর্বদিকে প্রাচীর ঘেরা দুটি ধ্বংসপ্রায় মন্দির দুত্যার বাড়ি নামে খ্যাত। 'দুত্যা' শব্দটি 'দৈত্য' অথবা 'দ্বিতীয়া' শব্দের অপভ্রংশ হওয়া সম্ভব। তাই সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা এদের মধ্যে একটিকে বিজয়মাণিক্য (২য়)-এর সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ দেবের মন্দির হওয়ার সম্ভাবনাকে যেমন বাদ দিতে পারেননি, তেমনি 'দুত্যা' শব্দটি দ্বিতীয়ার অপভ্রংশ হলে রামমাণিক্যের শ্যালক বলিভীমের কন্যা দ্বিতীয়া-র দ্বারা এই দুটি মন্দির নির্মাণের সম্ভাবনাকেও পাশাপাশি রেখেছেন। এছাড়াও তিনি গোবিন্দ মাণিক্যের অনুজ জগন্নাথদেবের কন্যা আরেক দ্বিতীয় দেবীরও উল্লেখ করেছেন। পূর্বদিকের দক্ষিণ দুয়ারী মন্দিরে শিলালিপি থাকলেও তার পাঠে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ অসমর্থ হন, কিন্তু ড. দীনেশচন্দ্র সরকার এ থেকে 'দ্বিতীয়া' ও 'শকাব্দ ১৬২১' পড়তে সক্ষম হয়েছেন। উপরোক্ত দুই দ্বিতীয়া দেবীই সমসাময়িক ছিলেন, কাজেই এদের মধ্যে যে কোনও জনই এই মন্দিরের নির্মাতা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

পশ্চিম দিকের দক্ষিণ দুয়ারী মন্দিরটিকে ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার মতই দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের নির্মিত জগন্নাথ মন্দির বলে অনুমান করেও শিলালিপির অভাবে নিশ্চিত হননি। রাজমালায় বলা হয়েছে, দৈত্যনারায়ণ পুরী থেকে জগন্নাথদেবের মূর্তি এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তা ভূমিকম্পে ফাটল ধরে—

কত কালে সেই মঠ ভূমিকম্পে ফাটে।
জানিলেক দেবমায়া পড়িবে সঙ্কটে।।

**১০) ষোলকোণা দালান :-**

ফুলকুমারী মৌজায় ধন্যসাগরের পূর্ব পাড়ে এটি একটি উঁচুস্থানে অবস্থিত।

এর গঠন অন্যান্য মন্দির থেকে স্বতন্ত্র। এতে অনেকগুলি কোণা দেখা যায়। মন্দিরের ইষ্টকগাত্রে কোনও আস্তরণ নেই। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয় একে বৈকুণ্ঠপুরী বলেছেন। তিনি এটি ধন্যমাণিক্য নির্মিত বলে জানিয়েছেন। কিন্তু শিলালিপির অভাবে এই মন্দিরটি কার তৈরি তা জানা যায়নি।

**১১) ঝুলন মন্দির :-**

গুণবতী মন্দির পেরিয়ে বদরমোকামের দিকে একটু এগিয়ে গেলেই রাস্তার ডান পাশে একটি দ্বিতল বিশিষ্ট মন্দির আছে। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত লিখেছেন—'প্রথম তলায় অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীগণ ইহাকে 'লুকপলানির দালান'-ও বলে। উপরতলায় দোচালা ঘরের ন্যায় প্রকোষ্ঠের উপরিভাগে চারি কোণে লৌহ নির্মিত আংটি সংযুক্ত ছিল; একটির ওইরূপ চিহ্ন এখনও আছে। এই প্রকোষ্ঠের চারিদিকে ইষ্টকের দেওয়াল গাত্রে ছাপ দেওয়া অনন্তসর্প ও বিষ্ণুর নানারূপ মূর্তির চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। ওই প্রকার অনেক ছবি বিনষ্টও হইয়াছে।'

এই সবই কল্যাণমাণিক্যের দোল মঞ্চের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজমালায় বলা হয়েছে—

পরেতে কল্যাণদেব রাজা ধর্ম্মময়।
পুরি নির্ম্মাইল এক বিষ্ণুর আলয়।।
নিজ পুর সম্মুখেত ছিল একস্থান।
তাহাতে বিষ্ণুর পুরি করিছে নির্ম্মাণ।।
বিচিত্র দেখীতে সব ঘরের শুঠাম।

কিন্তু শ্রীরাজমালায় বলা হয়েছে—

নিজপুর সম্মুখেতে ছিল একস্থান।
বিষ্ণুর আলয় তাতে করয়ে নিম্মাণ।।
দোলমঞ্চ নির্মাইল তার পূর্বদিকে।
দুর্গাগৃহ নির্মাইল সন্নিকট ভাগে।।

অবশ্য রাজমালায় 'বিচিত্র দেখীতে সব ঘরের শুঠাম' বলতে সম্ভবত এই ঝুলন-মন্দিরের কথাই বলা হয়েছে।

গোমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ে বদরমোকাম পল্লীতে গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ কালীপ্রসন্ন সেন দেখেছেন বলে শ্রীরাজমালায় জানিয়েছেন। প্রাসাদের ভগ্ন দেওয়াল ও অন্তঃপুরের মহিলাদের বড়শি দিয়ে নদীতে মাছ ধরার স্থান তাঁর কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামীও ১৯৪৮-৪৯ সালে এই দেওয়ালের ও প্রাচীরের কিছু অংশ দেখেছিলেন। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত বলেছেন যে, এই ভগ্নাবশেষ গোবিন্দ মাণিক্যের বাড়ি বলে কথিত হয়। তিনি লিখেছেন---'ইহার সম্মুখে কয়েকটি দেবমন্দির অবস্থিত। অনতিদূরেই বদর-মোকাম, গারদ, ঝুলন-মন্দির প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।'

কল্যাণমাণিক্যের নিজের রাজপ্রাসাদ নির্মাণের কথা রাজমালায় আছে---

তবে রাজা কল্যাণমাণিক্য নৃপবর।
নিজ পুরি করিলেক পরম সুন্দর।।
ইন্দ্রের অমরা জিনি পুরির সুঠাম।
হেন পুরি নির্ম্মাণ করিল গুণধাম।।

কল্যাণমাণিক্য এই রাজপ্রাসাদ তাঁর রাজত্বের প্রথমভাগেই করেন। রাজমালা অথবা শ্রীরাজমালার কোনটিতেই গোবিন্দমাণিক্যের প্রাসাদ নির্মাণের তথ্য নেই। গোমতী নদীর উত্তর পাড়ে বর্তমানে যে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তাকে স্থানীয় লোকেরা 'নক্ষত্র মাণিক্যের বাড়ি' বলে, একথা ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এবং শ্রীরাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন জানিয়েছেন। সম্ভবত, গোবিন্দমাণিক্য তাঁর পিতার নির্মিত প্রাসাদে থেকেই রাজ্য পরিচালনা করতেন বলে গোমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ের ওই প্রাসাদের অবশেষকে 'গোবিন্দ মাণিক্যের বাড়ী' বলা হত।

তাহলে রাজমালা ও শ্রীরাজমালার বর্ণনা অনুসারে এই ঝুলন মন্দিরটিকে কল্যাণ মাণিক্যের দোলমঞ্চ বলে প্রতিপন্ন করা যায়। এর অল্প পূর্বদিকেই দুটি মন্দিরের একটি বিষ্ণু মন্দির হতে পারে। অপরটি দুর্গা মন্দির হওয়াই সম্ভব। বর্তমানে এই মন্দিরটি এক গৃহস্থ বাড়ির ঠাকুরঘর।

**১২) রামমাণিক্যের বিষ্ণু মন্দির :-**

গোমতী নদীর উত্তর পাড়ে 'নক্ষত্র মাণিক্য' ওরফে 'ছত্রমাণিক্যের' যে রাজবাড়িটি দেখা যায়, তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেশ ভালো অবস্থায় একটি পূর্বমুখী মন্দির বর্তমান। বর্তমানে এই মন্দিরটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' খ্যাত ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির বলে প্রচার করা হচ্ছে। ত্রিপুরা তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতর একটি পুস্তিকায় একে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই মন্দিরটিকে রামমাণিক্য স্বর্গীয় পিতা গোবিন্দ মাণিক্যের স্বর্গাভিলাষে ১৫৯৯ শকের মাঘী পূর্ণিমা দিনে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন।

**১৩) রত্নাবতী দেবীর শিব মন্দির :-**

'ছত্রমাণিক্যের রাজবাড়ী'র দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এই মন্দিরটি অবস্থিত। শ্রীরাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন একে সাধারণ স্থানীয় লোক ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির বলে বিশ্বাস করেন বলে জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—'উদয়পুরে গোমতী নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী রাজবাড়ীর পশ্চিম দিকে একটি মন্দির আছে। তাহার অবস্থা এখনও নিতান্ত মন্দ নহে। সাধারণ লোকে ইহাকে ভুবনেশ্বরীর মন্দির বলে, কিন্তু এই বাক্য নির্ভরযোগ্য নহে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য এক মন পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব বা পরবর্তী অন্য কোনও রাজা ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ স্থাপন করিবার প্রমাণ নাই। আমার সহকারী শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাস উদয়পুর পরিভ্রমণ উপলক্ষে উক্ত মন্দিরের গাত্র চ্যুত এক খণ্ড শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। শিলাপট্ট বর্তমান সময়ে 'রাজমালা' কার্যালয়ে রক্ষিত হইতেছে। তাহার অধিকাংশ অক্ষর বিনষ্ট হওয়ায় তৎসাহায্যে মন্দিরের সম্যক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। তবে এই মন্দির যে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করা হইয়াছিল, শিলালিপি হইতে একথা উদ্ধার করা যাইতে পারে; সুতরাং ইহাকে 'ভুবনেশ্বরী মন্দির' বলিয়া নির্দেশ করা সঙ্গত হইবে না।'

শিলালিপির চতুর্থ পংক্তিতে 'ভূপাল মহিষী ধন্যা সতী রত্নাবতী বরা' থেকে বোঝা যায় যে, এই মন্দির নির্মাণে রত্নাবতী নামক কোন রাজার মহিষী যুক্ত

ছিলেন। শ্রীরাজমালার সম্পাদক এই রত্নাবতীকে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের মহিষী বলে মনে করেন। কিন্তু মুদ্রাসাক্ষ্যে এই রত্নমাণিক্যের সত্যবতী ও ভাগ্যবতী নামক দুই রানীর নাম আছে, কিন্তু রত্নাবতী নামক কোনও রানীর নাম পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে রাজ্যাভিষেক মুদ্রায় রামমাণিক্যের পত্নী রত্নাবতীর নাম আছে। কাজেই এই মন্দিরটি রামমাণিক্যের আমলে তাঁর পত্নী রত্নাবতী দ্বারা যে নির্মিত তা প্রমাণিত হয়।

শিলালিপির পঞ্চম লাইনে 'প্রীতয়ে হরেঃ' দেখে সকল বিশেষজ্ঞরাই—'হরে' শব্দটিকে হরি বা বিষ্ণু ভেবে এই মন্দিরকে বিষ্ণুমন্দির ভেবেছেন। কিন্তু 'হরে' এক্ষেত্রে হর বা মহাদেবও হতে পারে। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের সময়ে আগত অসম রাজার দুই দূত রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস রাজপ্রাসাদ অঞ্চলের বিস্তারিত বিবরণকালে কেবলমাত্র একটি বিষ্ণু মন্দির ও একটি শিব মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুমন্দিরটি নিঃসন্দেহে রামমাণিক্যের নির্মিত বিষ্ণুমন্দির; কাজেই রামমাণিক্যের পত্নী রত্নাদেবীর আলোচ্য মন্দিরটিই যে অসম রাজার দুই দূতের বর্ণিত শিবের মন্দির তা নিশ্চিত হয়। কিন্তু ত্রিপুরা তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরের 'UDAIPUR' নামক পুস্তিকায় একে রামমাণিক্যের বিষ্ণুমন্দির বলা হয়েছে।

**১৪) চন্দ্রপুরের গোপীনাথ মন্দির :-**

ত্রিপুরসুন্দরী মন্দির থেকে আরও প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে চন্দ্রপুর গ্রামে চন্দ্রসাগর নামক একটি বড় দীঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। রাজমালা থেকে জানা যায় যে, এই মন্দিরে মহারাজ উদয়মাণিক্য (১৫৬৭-৭৩ খ্রিস্টাব্দ) চন্দ্র গোপীনাথকে প্রতিষ্ঠিত করেন—

বহুল করিয়া জত্ন এক মঠ দিল।

চন্দ্রগোপীনাথ নাম শ্রীমূর্তি স্থাপিল।।

মন্দিরের অবস্থা খুবই করুণ হলেও এর তোরণটি এখনও ভালো অবস্থাতেই আছে। এ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—'এই স্থানের মন্দিরের প্রবেশদ্বারও হীরাপুরের ন্যায় সুবৃহৎ প্রস্তর নির্মিত। এই প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বেই বাঙ্গালা অক্ষরে, সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তরগাত্রে বিবরণ লিখিত আছে তাহা ক্রমশই অপাঠ্য হইয়া পড়িতেছে।'

এগুলি ছাড়াও উদয়পুরে আরও বেশকিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে চকবাজারের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ দুয়ারী দুটি মন্দির (যাদের আগে নাগের দোল বলা হত, কিন্তু বর্তমানে এরা ধর্মাশ্রম নামে পরিচিত), ছনবন এলাকায় গোমতী নদীর তীরে 'অমাত্যের দোল' নামে একটি ভগ্ন মন্দির, হীরাপুরে বিজয় মাণিক্যের বিষ্ণু মন্দির, পিত্রা অঞ্চলে বেশকিছু মন্দির, অমরপুরের মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

**১৫) কসবা (কমলাসাগর)-এর মন্দির :-**

মন্দিরটি কমলাসাগর নামক একটি দীঘির পূর্ব পাড়ে একটি অল্প উচ্চ স্থানে অবস্থিত। মন্দিরটি কল্যাণমাণিক্য দ্বারা নির্মিত বলে সংস্কৃত রাজমালায় উল্লেখ আছে। কৈলাসচন্দ্র সিংহ, কালীপ্রসন্ন সেন অথবা সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা সকলেই একে সমর্থন করেছেন।

মন্দিরটি পশ্চিমমুখী, বাকি তিন দিকের দেওয়ালেই শিলালিপি বর্তমান ছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ-এ বিষয়ে লিখেছেন—'মন্দিরের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে তিনখানি খোদিত প্রস্তরলিপি সংযুক্ত হইয়াছিল। উত্তর পার্শ্বের শিলালিপিতে যে কয়েকটি অক্ষর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে। পূর্ব পার্শ্বের লিপি খণ্ড সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বের শিলালিপির অন্ত ভাগে কেবল 'স ১০৯৭' অক্ষর দৃষ্ট হইয়া থাকে, অবশিষ্ট সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে।'

কাজেই এই একটি মাত্র সনতারিখই মন্দির সম্পর্কে আলোক দান করতে পারে। এই ১০৯৭ সনটি নিশ্চিতভাবে ত্রিপুরাব্দ, তখন নাবালক রাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকাল। অভিভাবক হিসেবে মাতুল বলিভীম নারায়ণ প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করছিলেন। শ্রীরাজমালায় রত্নমাণিক্য (২য়)-এর কালী মূর্তি স্থাপনের উল্লেখ আছে, কিন্তু মন্দির নির্মাণের উল্লেখ নেই—

কসবাতে কালীমূর্ত্তি করিল স্থাপন।

দশভূজা ভগবতী পতিত তারণ।।

কাজেই সংস্কৃত রাজমালায় যে কল্যাণমাণিক্যই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তা মেনে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু শিলালিপিগুলির অস্পষ্টতার কারণে তা নিশ্চিত হয় না।

রাজা সৌ কসবা গ্রামে কৃত্বা কল্যাণসাগরং।

তদন্তে দুর্গ মধ্যে চ স্থাপয়ামাস কালিকা।।

বাস্তবিকই কসবা অঞ্চলে কমলাসাগর ছাড়াও কল্যাণসাগর নামে আরেকটি দীঘি আছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে মন্দিরে কে মূর্তি স্থাপন করেছিলেন, সে নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। এই মূর্তিকে নাকি শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের অন্তর্গত কাশিমনগর পরগণার ধর্মসর গ্রামের এক ব্রাহ্মণের ঘর থেকে হরণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল। 'ত্রিপুর বংশাবলী'-তে এ নিয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা এ বিষয়ে বলেছেন—'ত্রিপুরেশ কল্যাণমাণিক্য উক্ত শক্তিদেবী-কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া মূর্ত্তিটি তথা হইতে আনয়নপূর্ব্বক প্রাগুক্ত 'কৈলারগড়' নামে প্রসিদ্ধ দুর্গ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।' অবশ্য শ্রীরাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন এই কার্যটি দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য দ্বারা সংঘটিত বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ঐ সময়ে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের বয়স মাত্র সাত বৎসর। তাঁর পক্ষে দুইজন অনুচরসহ উদয়পুর থেকে সুদূর হবিগঞ্জ এলাকায় গিয়ে দেবী মূর্তি অপহরণ অসম্ভবও বটে। তাই কল্যাণমাণিক্য দ্বারাই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়।

শিলালিপিতে মূর্তিটি কালিকা দেবীর বলা হলেও এই মূর্তিটি কষ্টিপাথরে তৈরী সিংহারোহণে দশভূজা দুর্গার মূর্তি বলেই প্রতীয়মান হয়। কেন একে কালিকা দেবী বলা হয়, তার সঠিক কারণ জানা যায় না। কালো কষ্টিপাথরে তৈরী বলেই কি তাঁর এমন নাম?

অবশ্য কৈলাসচন্দ্র সিংহ এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—'এই প্রতিমার নিম্ন ভাগে একটি শিব লিঙ্গ খোদিত থাকায় কালী মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়।'

এ পর্যন্ত যতগুলি মন্দিরের আলোচনা করা গেল, তার সবগুলিই ত্রিপুরার নিজস্ব মন্দির-শিল্প রীতিতে নির্মিত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এছাড়াও বঙ্গদেশের মত পঞ্চরত্ন, সতেররত্ন ইত্যাদি ভাস্কর্য শৈলীতে মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই দুটিই মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে নির্মিত।

**১) রাধানগরের পঞ্চরত্ন মন্দির :-**

বাংলাদেশের আখাউড়ার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে কালীগঞ্জ গ্রামে ১১৮৫ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণমাণিক্যের পত্নী জাহ্নবী দেবী মন্দিরটি নির্মাণের পর রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দিরটি দ্বিতল। ধনুরাকৃতি ছাদ বিশিষ্ট, ছাদের মধ্যস্থলে একটি চূড়া ছাড়াও মন্দিরের দ্বিতলে চার কোণে চারটি চূড়া বর্তমান ছিল। 'কৃষ্ণমালা'য় মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে—

ষোল শত সাতান্নব্বই শকের সময়।

প্রতিষ্ঠা হইল পঞ্চরত্ন দেবালয়।।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এই গ্রামের নাম রাধানগর হয়। ১৯১৮ সালে ত্রিপুরায় যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়, তাতে মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে এর কোনও সংস্কার হয়নি।

**২) কুমিল্লার সতের-রত্ন মন্দির :-**

এই মন্দিরটি বঙ্গীয় স্থাপত্য শিল্পে এক বিশেষ অবদান রাখে। কৃষ্ণমাণিক্য রাজা হওয়ার পর মন্দিরের নির্মাণ শুরু করেন এবং নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১১৮৮ ত্রিপুরাব্দে বা ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর মূর্তি স্থাপন করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণমালায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

সপ্তদশ শত সংখ্যা শকের সময়।

চৈত্রমাসে প্রতিষ্ঠা করিল দেবালয়।।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ভূমিকম্পে এই সপ্তদশ চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন বিশেষ কারণে মন্দিরটি কলুষিত হওয়ায় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের পত্নী সুলক্ষণা দেবী দ্বারা মন্দিরের দক্ষিণ দিকে আরেকটি মন্দির নির্মিত হয় এবং সতেররত্ন মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর মূর্তি নতুন মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়।

**৩) সুজা মসজিদ :-**

কুমিল্লা নগরীর সুজাগঞ্জ নামক পল্লীতে গোবিন্দমাণিক্য শাহজাদা সুজার স্মৃতিতে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন বলে শ্রীরাজমালায় উল্লেখ আছে---

গোমতী নদীর কূলে মজিদ স্থাপিয়া।

সুজা বাদশার নামে মজিদ করিয়া।।

সুজা নামে এক গঞ্জ রাজাএ বৈসাইল।

সুজাগঞ্জ নাম বলি তাহার রাখিল।।

ঘটনাচক্রে শাহজাদা সুজা ও গোবিন্দমাণিক্য উভয়ই রাজ্যচ্যুত হয়ে আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোবিন্দমাণিক্যের সৌজন্যে মুগ্ধ সুজা তাঁকে দুষ্প্রাপ্য নিমচা তরবারী ও একটি মূল্যবান হীরকাঙ্গুরীয় উপহার দেন। সুজা আরাকানে নিহত হন। রাজ্য প্রাপ্তির পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ গোবিন্দমাণিক্য সুজার নামে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

অবশ্য কৈলাসচন্দ্র সিংহ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে শাহ সুজা নিজেই ত্রিপুরা বিজয়ের স্মারক হিসেবে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু শাহ সুজার সঙ্গে কল্যাণ মাণিক্যের যুদ্ধ হলেও তাতে তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন তা বিবেচ্য। একথা ঠিক যে, ওই যুদ্ধে যে সন্ধি হয়, তাতে কল্যাণমাণিক্য যশোমাণিক্যের আমলে হারানো সমতল ত্রিপুরা বা উদয়পুর সরকার (পরে চাকলা-রোশনাবাদ) বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে জমিদারি হিসেবে ফেরৎ পান, অর্থাৎ কল্যাণমাণিক্য ওই অঞ্চল পুনরুদ্ধারে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাকে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই সুজা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা সংস্কার ত্রিপুরার রাজাদেরই পক্ষ থেকে করা হত। কালীপ্রসন্ন সেন জানিয়েছেন ১৩৪১-৪২ ত্রিপুরাব্দে (১৯৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দ) মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য সুজা মসজিদের পুনঃসংস্কার করেছিলেন। তাই কৈলাসচন্দ্র সিংহের মত ঠিক নয় বলেই মনে হয়।

আমরা আগেই বলেছি, উদয়পুরের সব মন্দিরগুলিই স্তূপশীর্ষ চারচালা স্থাপত্যের ত্রিপুরার এক নিজস্ব অবদান। কিন্তু এর পরিণত রূপ সময়ের কবলে ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলির মধ্যে স্পষ্ট করে দেখা যায়নি। এর একটি পরিণত

রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পিত্রার অভিমুখে যাওয়ার সময় তাঁর অভিজ্ঞতা এভাবে প্রকাশ করেছেন—'পুরানো রাজবাড়ী এলাকা অতিক্রম করে পিত্রা অভিমুখে অগ্রসর হলে রাজনগরে জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যক্ত পাশাপাশি দুটি মন্দির দেখা যায়। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই দুটি মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও কোনও বাংলা বিবরণে এগুলির উল্লেখ নেই। ত্রিপুরার এই দুটি মন্দিরেই এখনও অপূর্ব টেরাকোটা দেখা যায়। দুটির মধ্যে একটির গায়ে দুটি শিলালিপি আছে। অন্যটির শিলালিপি স্থানান্তরিত। সম্পূর্ণ ইঁটে তৈরি মন্দির দুটির অলংকরণ খুবই সুন্দর যদিও মন্দির গাত্র বড় বড় গাছপালায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে এবং স্থানে স্থানে ভেঙেও গেছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৬০২ শকে (১৬৮০ খ্রীঃ) নাজির শ্রীধরদেবের (বিষ্ণু) উদ্দেশ্যে মন্দিরটি উৎসর্গ করেন। মন্দির দুটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো ত্রিপুরার মন্দির নির্মাণ শৈলীর একটা পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় এগুলি দেখলে। দুটি মন্দিরই তোরণ, জগতি, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ সমন্বিত ও স্তূপ-সদৃশ চূড়ামণ্ডিত। মন্দিরের চারকোণের ঠেসনা বলয়াকৃতি অলংকরণযুক্ত এবং মন্দিরগাত্রে ত্রিভূজাকৃতি অলংকরণ ও লতাপুষ্প সদৃশ টেরাকোটার কাজ। একমাত্র হরি মন্দিরেই কিছুটা এই রকম কাজ দেখা যায়।'

ত্রিপুরার প্রাচীন মন্দিরগুলিতে যে টেরাকোটা ছিল উপরোক্ত উদাহরণই তার প্রমাণ। মুদ্রাগবেষক জহর আচার্জী লিখেছেন—"এখানকার মন্দিরগুলি প্রধানত 'রেখ-দেউল'। মন্দিরগুলির বর্হিদেশে কারুকার্যপূর্ণ টেরাকোটাও এখন আর অবশিষ্ট নেই। প্রাচীন মন্দিরগুলির দেওয়ালের কোণায় মাঝে মাঝে কারুকার্যপূর্ণ খোদিত ইটের 'কার্নিশ' পাওয়া গেছে। এগুলোর নকশা অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোভাবর্ধনের জন্য নানা ধরনের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক মন্দিরে গেঁথে দেওয়া হত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বলতে পারি বর্তমানে পূর্ব রাধাকিশোরপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল মাঠে অবস্থিত 'ষোলকোণা' মন্দিরটি ছিল ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ পোড়ামাটি শিল্পের মন্দির (Terracotta Temple)। এছাড়া অমরপুরে অবস্থিত প্রাচীন রাজবাড়ি তথা দুর্গটিতেও (১৪১৯ শকাব্দ/১৪৯৭ খ্রিঃ) প্রচুর টেরাকোটা ছিল। তবে আজ তা সম্পূর্ণ ধ্বংস বা বিলুপ্তির মুখে। উভয় মন্দিরই মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সময়ে তৈরি। অন্য কোনো মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ খুব একটা নেই।'

সমসের গাজির আক্রমণে কৃষ্ণমাণিক্য উদয়পুর থেকে রাজধানী পুরাতন আগরতলায় নিয়ে আসেন ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। আবার ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য বর্তমান আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ফলে এই অঞ্চলে ত্রিপুরার রাজাদের দ্বারা আরও কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি উদয়পুরের স্থাপত্য রীতির মত নয়।

**১) চতুর্দশ দেবতার মন্দির :-**

এই মন্দিরের ছাদ সমতল, উপরে অর্ধগোলাকার অন্ডের নিম্নাংশে আরও দুটি ঘণ্টাকৃতি অন্ড। মন্দির শীর্ষে কলস ও পতাকাদণ্ড। মন্দিরের বাইরের মণ্ডপটি আয়তাকার, এবং গর্ভগৃহ চারকোণা আকৃতির।

মন্দিরে কোনও শিলালিপি নেই, তবে কৃষ্ণমাণিক্যের উদয়পুর থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন আগরতলায় আসার অব্যবহিত পরেই যে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়, তা নিশ্চিত। প্রতি বছরই খারচি পূজা উপলক্ষে মন্দিরে জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।

**২) জগন্নাথ মন্দির :-**

আগরতলায় কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত এই মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধাকিশোরমাণিক্যের পত্নী মহারানী তুলসীবতী ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন। মন্দিরটি অষ্টকোণা এবং প্রত্যেক কোণায় স্তম্ভ আছে, তাদের গায়ে তবক দেওয়া কুলুঙ্গি এবং মাথায় ত্রিকোণা শঙ্কু। গর্ভগৃহের মাথায় অষ্টকোণা চূড়া এবং চূড়ায় জালিকা সদৃশ অলংকরণ আছে। এর থেকে চারটি চূড়া উপরে উঠে গেছে। উপরে আমলক উল্টো পদ্মের আকৃতি বিশিষ্ট। এর উপর পতাকা। মন্দিরের শীর্ষ ভাগ অনেকটা পিরামিডের মতো। ড. ডি. এন. গোস্বামী এই রীতিতে হিমালয় অঞ্চলের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন।

এই ধরনের মঠ নির্মাণ শৈলী আগরতলার মঠ চৌমুহনির মঠ ও পুরাতন আগরতলার মঠগুলিতে দেখা যায়। বর্তমানে আগরতলার এই জগন্নাথ মন্দিরটি গৌড়ীয় মঠ দ্বারা পরিচালিত।

**৩) লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি :-**

এই প্রসিদ্ধ মন্দিরটি রাধাসাগর দীঘির দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। মন্দিরটিতে মিশ্র নির্মাণ রীতি লক্ষ্য করা গেলেও স্তূপ-শীর্ষ ও গর্ভগৃহকে ঘিরে প্রদক্ষিণ পথ ত্রিপুরা-রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বীরেন্দ্র কিশোরমাণিক্য ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটিকে রাধা-বৃন্দাবন চন্দ্রের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী।

**৪) শিববাড়ি :-**

আগরতলা শহরের মূলকেন্দ্রে সেন্ট্রাল রোড ধরে দক্ষিণে কিছুটা এগিয়ে মহারাজগঞ্জ বাজারের কাছাকাছি রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরগাত্রে শিলালিপি অনুসারে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের পত্নী মহারানী প্রভাবতী দেবী ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) ১৮ বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া দিনে মহারাজের স্বর্গ কামনায় শঙ্করকে এই মন্দির উৎসর্গ করে ভিত্তি স্থাপন করেন।

পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটির গঠন শৈলী ত্রিপুরা রীতি অনুসারে হয়নি। মন্দিরের ছাদ চার-চালা রীতিতে হলেও এতে চার-চালার চারটি স্তর আছে, একটি উপর আরেকটি চারচালা নিচ থেকে উপরে ক্রমশ ছোট হয়ে বিন্যস্ত আছে। এর উপরে পদ্মের আকারে আমলক, তাতে তিনটি কলসের উপর একটি নারিকেল এবং তার উপরে ত্রিশূল আছে। গর্ভগৃহকে ঘিরে বাইরে তিন ফুট প্রশস্ত একটি পরিক্রমা পথ আছে।

মন্দিরে প্রবেশ পথেই একটি তোরণ আছে, যা মিশ্র সংস্কৃতিতে গড়া। এর দু পাশে দুটি ছোট ঘর আছে, সম্ভবত এখানে প্রহরীরা বসত। তোরণেও একটি শিলালিপি আছে।

মূল মন্দিরের সামনে একটি সমতল ছাদ দেওয়া নাটমণ্ডপ আছে। মন্দিরে প্রতিদিনই কম-বেশি ভক্ত আসে, তবে শিব চতুর্দশী দিনে প্রচুর পরিমাণে মহিলা ভক্তের সমাগম হয়।

**৫) পাখাম্বা দেবতার মন্দির :-**

পুরানো মোটরস্ট্যান্ড পেরিয়ে আসাম-আগরতলা রোড ধরে কিছুটা

এগোলেই এই মন্দির পাওয়া যায়। মণিপুরিদের দেবতা পাখাম্বা অবশ্য সাধারণত মন্দিরে পূজিত হন না। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি কাহিনি আছে। রাধাকিশোর জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ায় তাঁকে মহারাজ বীরচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেও পরে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ভানুমতীর পুত্র সমরেন্দ্র চন্দ্রের উপর যাবতীয় স্নেহ বর্ষিত হলে রাধাকিশোরের মাতা রাজেশ্বরী যুবরাজের ভবিষ্যতের অমঙ্গল চিন্তায় তাঁর পূর্বপুরুষদের দেবতা পাখাম্বার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। রাধাকিশোর রাজা হলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি এই দেবতার পূজা দেন। সেই সময়ই মহারাজ এই মন্দিরটি গড়ে পাখাম্বা দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দিরের গঠন অনেকটা ত্রিপুরা রীতিতেই গড়া, এতে গম্বুজ আছে। মন্দিরে বর্তমানে যে দেবতা আছেন, তিনি রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহের সৃষ্টি। এই বুদ্ধিমন্ত সিংহ শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্য এবং হস্তকারুশিল্পের শিক্ষক ছিলেন। মূর্তি পিতলের গড়া, সিংহাসনে সর্পপ্রতীক, মন্দিরের চূড়াতেও সর্প। প্রতি শুক্রবারে পূজা হয়। জানুয়ারি মাসে চারদিনের মণিপুরি উৎসব লাইহারোবা পালিত হয়। মন্দিরটি 'পাগলা দেবতার মন্দির' বলে অধিক পরিচিত, কিন্তু এই নামকরণের হেতু কি, তা জানা যায় না।

**৬) উমা-মহেশ্বর মন্দির :-**

রাধাসাগরের পূর্ব পাড়ে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি ১৯৩৮ সালে বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য দ্বারা নির্মিত। পশ্চিম দুয়ারী এই মন্দিরের গঠন শৈলী মিশ্র স্থাপত্য শিল্পের রীতিকে বহন করে। 'পুর সংবাদ' সাময়িকীতে ড. সুমঙ্গল সেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন---'গৈরিকবর্ণের সুউচ্চ মন্দির, কাশীবিশ্বনাথের মন্দিরের কথা মনে করিয়ে দেয়।' এই মন্দিরের মূর্তি সম্পর্কে সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন---''ন্যূনাতিরেক পঞ্চাশৎবর্ষ অতীত হইল বীরমণি হাজারী নামক জনৈক ত্রিপুর রাজকর্মচারী চৌদ্দগ্রাম পরগণার পূর্বদিকস্থ খণ্ডল পরগণায় একটি পুষ্করিণী খনন করাইবার কালে মৃত্তিকার গর্ভ হইতে একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত শিব-শক্তির প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তি সেই স্থান হইতে নীত হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের নব রাজধানী 'নূতন হাবেলী' বা 'নূতন আগরতলা' নামে খ্যাত নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় সর্বসাধারণে বর্ণিত মূর্তিকে 'উমা-মহেশ্বর' নামে অভিহিত করে।' কষ্টিপাথরে তৈরী এই যুগল মূর্তিতে উমা (অর্থাৎ পার্বতী) মহাদেবের বাম

কোলে উপবিষ্টা এবং বাম বাহু দ্বারা আলিঙ্গানাবদ্ধ। বর্তমানে এই মন্দিরের সেবাভার শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের উপর ন্যস্ত।

**৭) বেণুবন বিহার :-**

কুঞ্জবনে প্রধান রাজপথের উপরই বৌদ্ধবিহার স্থাপত্যের আদলে নির্মিত এই ধর্মস্থল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত এই গৈরিক বর্ণের মন্দিরটি মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের নিজ হস্তে অঙ্কিত নকশা অনুসারে নির্মিত বলে জানা যায়। মন্দিরের নির্জনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মন্দিরের চারিদিকে উদ্যানের শোভা সামগ্রিক ভাবে দর্শকের মন কেড়ে নেয়। এখানে ১৯৫৬ সালে ২৫০০তম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব বহু পন্ডিত ও গুণীজনের উপস্থিতিতে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়েছিল। এটি ত্রিপুরার একটি পর্যটনস্থল।

এসব ছাড়াও দুর্গাবাড়ি (বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য দ্বারা নির্মিত), নরসিং আখড়া (রাধাকিশোর মাণিক্য প্রতিষ্ঠিত), ভাটি অভয়নগরের রাধামাধব মন্দির (রাধাকিশোর মাণিক্য দ্বারা নির্মিত), অভয়নগরের পুথিবা মন্দির (বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের দ্বারা নির্মিত), পুরাতন আগরতলার কালাচাঁদের মন্দির (কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের পত্নী রত্নমালা দেবী নির্মিত---বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত) ইত্যাদি আরও কিছু মন্দির ত্রিপুরার রাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু, মন্দির ভাস্কর্যের দিক দিয়ে এরা উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হলো না।

**সংযোজন :-**

১) আগরতলার মঠ চৌমুহনীর মঠটি মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের তৃতীয় পত্নী মনোমোহিনী দেবী তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে ১৩০২ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। এই মঠটির সঙ্গে আগরতলার জগন্নাথদেবের মঠের যথেষ্ট মিল আছে।

২) আগরতলার লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির শিলালিপিতে লেখা রয়েছে---'বর্ষে সায়ক পক্ষ নেত্র শশভৃতমানেমাধাও ত্রিপুরা'। এক্ষেত্রে সায়ক অর্থাৎ বাণ =৫; পক্ষ=২; নেত্র=৩ এবং শশ বা চন্দ্র=১ অর্থাৎ অঙ্কস্য বাম গতি অনুসারে, ১৩২৫ ত্রিপুরাব্দ বা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু, ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী এবং ড.জগদীশ গণচৌধুরী উভয়ই নির্মাণকাল ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু

অ্যাডমিনিস্ট্র্যাশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই এই মন্দিরের কার্য সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে ড. সুমঙ্গল সেন জানিয়েছেন---'১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের সৌষ্ঠব দৃষ্টি নন্দন, সম্মুখ ভাগ, নাটমণ্ডপ ইত্যাদি নির্মাণের ব্যয় বহন করলেন বীরেন্দ্র কিশোরের মহারানী অরুন্ধতী দেবীর মধ্যমা ধাত্রী আর শ্রীমতী বিজলী জোয়ারি। দানের পরিমাণ সেকালের অর্থে পনের-কুড়ি হাজার টাকা।'

**উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ :-**

এই রাজপ্রাসাদটি ত্রিপুরার একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে এই ধরনের সুদর্শন একটিও স্থাপত্য শিল্পের উদাহরণ আর মেলে না। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে পুরানো রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে রাধাকিশোরমাণিক্য কলিকাতার বিখ্যাত আর্কিটেক্ট সংস্থা মেসার্স মার্টিন অ্যান্ড কোং-এর সহায়তায় ১৯০১ সালে এই রাজপ্রাসাদের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেন। এই রাজপ্রাসাদে রোমান, গ্রীক, মোগল ও ভারতীয় স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল মিশ্র সংস্কৃতির উদাহরণ দেখা যায়। রাজপ্রাসাদের সামনে দুটি বিশাল সরোবর, সিংহদ্বার থেকে প্রাসাদের সিঁড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথ ও সুবিন্যস্ত উদ্যান ইত্যাদি রাজপ্রাসাদের শোভা আরও বাড়িয়েছে।

বর্তমানে এই রাজপ্রাসাদটি যাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**পুষ্পবন্ত প্রাসাদ :-**

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ থেকে প্রায় মাইল খানেক দূর এক নাতি উচ্চ টিলার উপরে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য এই বিশ্রাম ভবনটি ১৯১৭ সালে নির্মাণ করেন। মহারাজা নিজেই এই ভবনের নকশা তৈরি করেন। চারিদিকের সবুজ বনানীর নানা প্রস্ফূটিত বনজ ফুলের মধ্যে এই প্রাসাদ এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে। ভবনের পূর্বাংশের গোল বারান্দা থেকে দূরের বড়মুড়া পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য দর্শককে মোহাচ্ছন্ন করে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রিপুরা ভ্রমণের সময় তাঁকে এখানেই রাখা হয়েছিল। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন---"পৃথিবীতে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র অনেক দেখিয়াছি কিন্তু ত্রিপুরার কুঞ্জবনের শৈল শ্বেত ভবন আমার স্মৃতি হইতে মলিন হইতে

পারিতেছে না।" পরবর্তী সময়ে এর প্রবেশপথ ও একে ঘিরে বাগানকে পরবর্তী শাসকদের ইচ্ছা বা প্রয়োজনে পরিবর্তিত করা হয়।

**নীরমহল :-**

আগরতলা থেকে সোনামুড়া যেতে সোনামুড়ার ৮ কিলোমিটার আগে মেলাঘর অঞ্চলে রুদ্রসাগর নামে এক বিশাল হ্রদ দেখা যায়। এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য এই হ্রদের মধ্যস্থলে এক অপরূপ প্রমোদভবন নির্মাণ শুরু করেন এবং নির্মাণ কার্য শেষ হলে ১৯৩৮ সালে এর উদ্বোধন করেন। হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত এই প্রাসাদ দর্শককে মোহাবিষ্ট করে।

এছাড়াও রাজধানী আগরতলায় বেশকিছু মনোহর সৃষ্টি ছিল, যাদের অস্তিত্ব আজ নেই। এর মধ্যে একটি হচ্ছে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ সংলগ্ন 'লালমহল' (লাট মহল?)। গ্রিকো-রোমান রীতিতে গড়া এই দ্বিতল ভবনের বহির্সৌন্দর্য ছিল অপরূপ, তেমনি তাঁর অন্দর ভাগও ছিল একই মাত্রার সুসজ্জিত ও মনোহর। রাজ অতিথিদের জন্য মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য এই ভবনটি নির্মাণ করেন। ভবনের ভিতরে বিদেশ থেকে আনা মোজাইক ও গ্লেইজড টাইলস ও রাজস্থানের শ্বেতপ্রস্তরে মেঝে ও অর্ধ দেওয়াল আচ্ছাদিত ছিল। ব্রহ্মদেশের কাঠের সিলিং এবং দেওয়ালে চিনা মিস্ত্রির অপূর্ব কারুকার্য খচিত নকশাযুক্ত কাঠের প্যানেল, ড্রইংরুমে মনুষ্যাকৃতি আয়না, বাথরুমে বিদেশের শ্বেতশুভ্র পর্মিলিনের কমোড ও প্যান, বাইরের জুনিপ্রাস বীথিকা, বেগুনভিলা প্রভৃতি গুল্মলতার বাহার ইত্যাদি অতিথিদের মনোরঞ্জন করত। বাইরের লাল রঙের জন্যই এর নাম হয়েছিল লালমহল। দুঃখের বিষয়, এই সুদৃশ্য ভবনটি ১৯৮৬-৮৭ সালে ভেঙে বর্তমান 'টাউন হল'টি নির্মিত হয়।

এছাড়া ছিল তুলসীবতী স্কুলের কাছেই আখাউড়া খালের উপর একটি নয়নাভিরাম তোরণ, যাকে 'জ্যাকশন গেট' বলা হত। মোগল স্থাপত্যের আদলে গড়া হায়দ্রাবাদের 'চার মিনার'-এর অনুকরণে এই তোরণটি প্রস্তুত করা হয়। এতে ৩০ ফুট উচ্চতার চারটি মিনার ছিল। এতে বায়ু চলাচলের জন্য জাফরি ও কারুকার্যময় গবাক্ষ ছিল। মিনারের চারিদিকে লতাপাতার সুদৃশ্য ভাস্কর্য ছিল। মহারাজ বীরবিক্রমের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বাংলার গভর্নর লর্ড স্ট্যানলি জ্যাকসনের আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এই তোরণটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য একেও ভেঙে ফেলা হয়েছে।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহারাজ বীরবিক্রমের পরিকল্পনা অনুসারে গ্রিক স্থাপত্যের অনুকরণে গোলাকৃতি জায়গা জুড়ে বড় বড় থাম দিয়ে ইমারত স্থাপন করে যে 'মহারাজগঞ্জ বাজার'টি স্থাপিত হয়েছিল, বাজারটি থাকলেও অবহেলায় আজ সেই ইমারতের অস্তিত্ব নেই। তবে বাজারের আকৃতিটিকে মনে রেখে আজ এটি 'গোলবাজার' নামে অধিক পরিচিত।

তুলসীবতী স্কুলের ঠিক উত্তরে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের গথিক ও মোগল স্থাপত্যের রীতিতে গড়া সুদৃশ্য অভিষেক মণ্ডপ, আজও যার ভগ্নাবশেষ বিরাজ করছে।

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ভাস্কর্যের উদাহরণগুলি ছড়িয়ে আছে, সেগুলির উপযুক্ত সংরক্ষণ নিতান্তই জরুরি। রাজন্য আমলের পর এইসব অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদের অনেকগুলিই অবহেলায় অনাদরে বিনষ্ট হয়েছে।

এখনও যেগুলি অক্ষত আছে তাদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্তগুলিকে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা এখনই আরম্ভ না করলে চিরস্থায়ী ক্ষতি হয়ে যাবে। এইসব কীর্তিগুলিকে ঘিরে পর্যটন শিল্প আরও বেগবান হয়ে উঠতে পারে।

**সংযোজন :-**

পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড থেকে কামান চৌমুহনির পূর্ব দিক হয়ে শিববাড়ি পর্যন্ত আগে বৃহৎ থামওয়ালা বারান্দাসহ দোকান ঘর ছিল। আবার জ্যাকসন গেট থেকেও সেন্ট্রাল রোডের দুপাশে একই ভাবে থামওয়ালা বারান্দাসহ দোকান ঘর ছিল যা সূর্য চৌমুহনি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগরতলার সৌন্দর্যায়নেই ত্রিপুরার রাজাদের এই অবদান ছিল। এই বারান্দা ক্রেতা ও পথচারীদের ফুটপাত হিসেবে ব্যবহৃত হত। এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখলে শহরের প্রাচীনত্বের প্রমাণ যেমন মিলত, তেমনি আগরতলার সৌন্দর্য আরও বেড়ে যেত।

# ৫ জলাশয় প্রতিষ্ঠা

বহু প্রাচীনকাল থেকে বড় বা ছোট দীঘি বা জলাশয় পানীয় জলের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ওই সময়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহারের জন্য যেমন কোনও দীঘি বা পুকুর কাটা হত, তেমনি সেকালে জল দান একটি পুণ্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় প্রজা সাধারণের জন্য পানীয় জলের উৎস হিসেবে রাজা অথবা সামন্ত রাজারা বড় বড় দীঘি খনন করিয়ে নিজেদের কীর্তি প্রকাশ করতেন। ত্রিপুরার রাজারাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

রাজমালার শুরু ত্রিপুর রাজবংশের অসমের নওগাঁও অঞ্চলে কপিলী নদীর তীরে বসতি দিয়ে। সেখানে এখনও কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক উদাহরণ না পাওয়া গেলেও কাছাড় উপত্যকায় খলংমা (বর্তমানে খরংমা) অঞ্চলে এখনও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ মেলে। অনেকে আবার ভাঙ্গা অঞ্চলে দ্বিতীয় রাজধানীর কথাও বলেন। কারণ জায়গাটি আনাইর হাওর নামে পরিচিত। তিপ্রা ভাষায় 'আনাই'-এর অর্থ ছেলে। এই অঞ্চলে প্রায় কুড়ি বর্গমাইল অঞ্চল জুড়ে অজস্র দীঘি ও ইটের ছড়াছড়ি।

রাজমালায় কোনও ত্রিপুর রাজার দীঘি খননের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম ধর্মমাণিক্যের আমলে। প্রথম ধর্মমাণিক্য (১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দ) কাণ্ডে বলা হয়েছে—

ধর্ম্মসাগর দিল সেই মহাজন।।

কিন্তু এই ধর্মসাগর কোথায় অবস্থিত, তা রাজমালায় উল্লেখ করা হয়নি। কুমিল্লা শহরে একটি ধর্মসাগর আছে, তাকেই কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রথম ধর্মমাণিক্যের কীর্তি বলে সর্বপ্রথম ভুলটি করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে টীকায় লিখেছেন—'রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি 'ধর্ম্মসাগর' নামে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন।' তিনি আরও লিখেছেন—'ধর্ম্মসাগর' নামে দুইটি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটি প্রাচীন কৈলারগড় রাজধানীতে, অন্যটি কুমিল্লা নগরীর বক্ষে বিষ্ণু বক্ষঃস্থিত কৌস্তভ মণির ন্যায় দর্শক মণ্ডলীর নয়নানন্দ বর্ধন করিতেছে। রাজমালা লেখক কেন যে একটি ধর্ম্মসাগরের উল্লেখ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না।'

মুদ্রাসাক্ষ্যে প্রমাণিত যে, প্রথম ধর্মমাণিক্যই ডাঙ্গর ফা, তিনি রত্নমাণিক্যের পিতা। রাজমালায় তাঁর রাজ্যসীমার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, প্রথম ধর্মমাণিক্যের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্য কুমিল্লা (ওই সময়ে মেহেরকুল) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না (এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় মৃণালকান্তি দেবরায়ের 'রাজমালা' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)।

কৈলাসচন্দ্র সিংহের এই ভুলটি আরও পল্লবিত হয় কালীপ্রসন্ন সেনের 'শ্রীরাজমালা' সম্পাদনকালে। রাজমালায় প্রথম ধর্মমাণিক্যের ভূমি দানের ঘটনার সঙ্গে এই ধর্মসাগরের কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেন মূল রাজমালাকে অপরিবর্তিত রাখলেও 'মধ্যমণি'-তে ভূমিদানের তাম্রপত্রের বয়ানে ধর্মসাগরকে যোগ করে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেন---

জলাশয়ং দ্বিজায়ে মং ধর্ম্মসাগরমাখ্যয়া।

কিন্তু এই কৃতকর্মের জন্য দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের কীর্তি মধ্যমণিতে ব্যাখ্যাকালে কালীপ্রসন্ন সেনকে বিপদে পড়তে হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে কৈলাসচন্দ্র সিংহের উল্লিখিত দুটি ধর্মসাগরই দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের কীর্তি (এ বিষয়ে বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য)। প্রথম ধর্মমাণিক্যের এই ধর্মসাগরের অবস্থান কোথায়, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ধর্মমাণিক্য (১ম)-এর সময়েও কাছাড় ও শ্রীহট্টের লোকদেরই প্রতিপত্তি ছিল। এই সময়েই উদয়পুরে রাজধানী সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। তাই ওই ধর্মসাগর সমতল কাছাড় অথবা দক্ষিণ শ্রীহট্টে নতুবা উদয়পুরেও থাকতে পারে। তবে কি উদয়পুরের মাতাবাড়ির বাউস্যাপাড়ার ছোটখাটো 'ধর্মসাগর'টিই প্রথম ধর্মমাণিক্যের কীর্তি?

এটা লক্ষণীয় যে, উদয়পুরে ধন্যমাণিক্যের আগে ত্রিপুর রাজাদের কোনও কীর্তি নেই। তাই এটা স্পষ্ট যে, উদয়পুরে তাঁদের রাজধানী স্থাপন এর খুব একটা আগে হয়নি। অবশ্য ধন্যমাণিক্য-পরবর্তী প্রায় সব রাজারাই রাজধানী অঞ্চলে কীর্তি হিসেবে দীঘি খনন করিয়েছিলেন। এই দীঘিময় উদয়পুরের বিশেষ বিশেষ দীঘিগুলির অবস্থান ও পরিচয় আলোচনা করা হল---

**১) ধন্যসাগর :-**

উদয়পুরের সবচেয়ে বড় দীঘির মধ্যে এটি অন্যতম। ফুলকুমারী মৌজায়

অবস্থিত এই দীঘিটির পরিমাপ আনুমানিক ১৬০০ হাত × ৪৮০ হাত (অপর পক্ষে শ্রীরাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনের মতে ১০০০ গজ × ২৭০ গজ)। খণ্ডল জয় করার পর দেশে ফিরে এসে ধন্যমাণিক্য এই দীঘি খনন করান।

দেসে আইসে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মে করে নিষ্ঠা।

মঠ দিয়া ধন্যসাগর করিল প্রতিষ্ঠা।।

রাজমালা অনুসারে এই দীঘির খনন কার্য দুই বৎসরে সমাপ্ত হয়। এর পর ধন্যমাণিক্য এই দীঘির চারদিকে নানা শ্রেণির লোকের বসতি করান।

সাগরের চারি পাষে বৈসে নানা জাতি।

নানা রঙ্গে বাস করে হইয়া মন প্রীতি।।

বর্তমানে দীঘির চারপাশের লোকজনের জমি দখলে এর আয়তন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে সরকারিভাবে এতে মৎস্য চাষ করা হয়।

**২) কমলা সাগর :-**

উদয়পুর শহর থেকে পশ্চিমে আনুমানিক ১২/১৩ কিলোমিটার দূরে এই দীঘিটি অবস্থিত। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত লিখেছেন—'বর্তমানে এই দীঘির নামানুসারে মৌজার নামও কমলাসাগর রাখা হইয়াছে।' এই দীঘির উত্তর পাড়ে, পুরাতন রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। এই ধ্বংসাবশেষে অর্ধচন্দ্র ও ১৪৪১ ছাপযুক্ত বহু ইট পাওয়া গেছে। এই ১৪৪১ নিশ্চিতভাবেই শকাব্দ। এই সময়ে ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। তাঁর আমলেই রাজমহিষী কমলাদেবী এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজমালায় বলা হয়েছে—

বিষ্ণু সম্প্রদান কৈল কমলা পুণ্যবতি।

কমলা সাগর বলি লোকে করে ক্ষ্যাতি।।

কমলা সাগর তাকে জানিবা নিশ্চয়।

তৃণ নহি হএ জলে পরিপুন্ন রয়।।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত লিখেছেন—'বর্তমান উদয়পুর টাউনের ৭/৮ মাইল দূরবর্তী কমলাসাগর নামক স্থানে, কাচী নদীর সন্নিকটে, কতকগুলি পুরাতন অট্টালিকা

ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কমলাসাগরের উত্তর পাড়ে ওই সকল প্রাচীন কীর্তি বর্তমান আছে।' সম্ভবত এই মন্দিরটিই রাজমালা-উক্ত কমলাদেবীর সেই বিষ্ণু মন্দির।

**৩) বিজয় সাগর :-**

মহাদেববাড়ির দক্ষিণে সংলগ্ন অঞ্চলে এই দীঘিটি অবস্থিত। এর আয়তন ৫০০ হাত × ৩০০ হাত (শ্রীরাজমালা অনুসারে ৩৮২ গজ × ২৩৭ গজ)। দীঘিটি বর্তমানে 'মহাদেববাড়ি দীঘি' নামে অধিক পরিচিত।

শ্রীরাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন এই দীঘিটি দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্য (১৫৩২-৬৪ খ্রিস্টাব্দ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে জানিয়েছেন, কিন্তু রাজমালা বা অন্য কোনও গ্রন্থ থেকে তার পুষ্টি মেলে না। দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্য খণ্ডে বিজয়মাণিক্যের হীরাপুরে দীঘি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে—

হিরাপুরে মঠ দিল দিঘি দুইখান।।

হিরাপুরে গোপীনাথ শ্রীমূর্ত্তি স্তাপিয়া।

তাম্রপত্র করি দিল গ্রাম উৎসর্গিয়া।।

কিন্তু উদয়পুরে কোনও দীঘি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ নেই। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত হীরাপুরের মন্দিরটি প্রসঙ্গে লিখেছেন—'এই মন্দিরের সংলগ্ন একটি পুষ্করিনী এবং সন্নিকটে ছোট বড় দীঘি পুষ্করিণী অনেক আছে।'

**৪) চন্দ্রসাগর :-**

ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দির থেকে আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়ক ধরে কিছুটা এগোলেই উত্তর চন্দ্রপুর গ্রামে রাস্তার ডান দিকে একটি বিশাল দীঘি চোখে পড়ে। এই দীঘিটি উদয়মাণিক্য (১৫৬৭-৭৩ খ্রিস্টাব্দ) খনন করান বলে রাজমালায় উল্লেখ আছে—

উদয়মাণিক্য ছিল অতি অনুপাম।

চন্দ্রসাগর রাখিলেক দিঘিকার নাম।।

দীঘিটি আয়তনে ১০১১ × ৫৯২ হাত (শ্রীরাজমালা অনুসারে ৫০৫ গজ × ২৬১ গজ) বলে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন।

উদয়মাণিক্য প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। তিনি রাজত্বের লোভে নিজ জামাতা বিজয়মাণিক্যপুত্র অনন্তমাণিক্যকে হত্যা করে রাজা হন এবং রাজধানী চন্দ্রপুরে স্থাপন করেন। রাজমালায় বলা হয়েছে—

উদয়মাণিক্য রাজা চন্দ্রপুরে গেল।

নিজ গৃহ সিংহাসন সেখানে করিল।।

**৫) বুড়িয়া (বুড়ার) দীঘি :-**

এই দীঘিটি মাতারবাড়ি মৌজায় অবস্থিত। ত্রিপুরসুন্দরী মাতার বাড়ির উত্তরে ব্রহ্মছড়া নামে ছোট পাহাড়ি নদী আছে, যা সুখসাগর জলায় পড়েছে। এই ছড়ার উত্তর দিকে উঁচু পাড় বিশিষ্ট একটি বড় দীঘি আছে, যাকে স্থানীয় লোকেরা 'বুড়ার দীঘি' বলে। দীঘিটি আকারে দৈর্ঘ্যে ১১২০ হাত × প্রস্থে ৪৪০ হাত (শ্রীরাজমালা অনুসারে ৫৫০ × ২০০ গজ)।

উদয়মাণিক্য রাজা হয়েই তাঁর বয়স্ক ভগ্নিপতি রণাগণ-কে সেনাপতি করেন। উদয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর পুত্র জয়মাণিক্য (১৫৭৩-৭৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজা হলে রণাগণ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। শ্রীরাজমালায় এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্য দীঘিটি খনন শুরু করলেও তা অসম্পূর্ণ থাকে, এরপর জয়মাণিক্যের আমলে রণাগণ তা শেষ করেন। বয়সে অতি বৃদ্ধ থাকায় তিনি 'বুড়িয়া' নামেও খ্যাত ছিলেন। শ্রীরাজমালায় বলা হয়েছে—

এক দীঘি বিজয়মাণিক্য খনে অর্দ্ধেক।

বকচর খনি রাজা স্বর্গেতে গেলেক।।

রণাগণ পরে তাকে খনায়ে কয়েক।

উৎসর্গিয়া বুড়া দীঘি নাম রাখিলেক।।

**৬) অমরসাগর :-**

এটি উদয়পুরের সবচেয়ে বড় দীঘি। এটি দৈর্ঘ্যে ২৪৫৬ হাত এবং আনুমানিক প্রস্থ ৬০৪ হাত (শ্রীরাজমালা মতে ১২২৮ গজ × ৩০২ গজ)। রাজমালায় এই দীঘিটি খননের বিস্তৃত বিবরণ আছে। অমরমাণিক্য উদয়পুরে একটি দীঘি কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে পার্শ্ববর্তী বঙ্গীয় জমিদারদের কাছে

লোকের সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁরা সর্বমোট ৭১০০ জন দাঁড়ি (খননকারী) পাঠান। শ্রীরাজমালায় বলা হয়েছে—

পনর শ শকে অমরসাগর আরম্ভন।

তিন বর্ষে সাগর খনা হৈল সমাপন।।

অমর মাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৭৭-৮৬ খ্রিস্টাব্দ। তাই শ্রীরাজমালা অনুসারে অমরসাগরের খনন কার্য ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়। অসম রাজার দুই দূত রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাসের বিবরণীতে এই দীঘির উল্লেখ আছে। এই দীঘির চারপাশে তাঁতি, স্বর্ণকার, কামার, চামার, সূত্রধর, ধোপা, বাড়ই এইসব লোকের বাড়ি আছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

ইদানীং মৎস্য চাষের সুবিধার জন্য অমরসাগরের মধ্যে বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট পুকুর তৈরি করায় অমরসাগরের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

**৭) রাজধরমাণিক্যের দীঘি :-**

এটি উদয়পুর-সোনামুড়া রাস্তার পাশে রাজধর নগর মৌজায় অবস্থিত। আকারে দৈর্ঘ্য ৫০০ হাত এবং প্রস্থে ৩০০ হাত (শ্রীরাজমালায় ৩৬০ গজ × ২৪০ গজ)।

আরাকান রাজার সঙ্গে অমরমাণিক্যের যুদ্ধের প্রাক্কালে পুত্র রাজধর এই দীঘিটি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজমালায় আছে—

তিন পুত্র পাত্র মন্ত্রি জুদ্ধেত চলিল।।

তবে রাজধর পুত্র করি জোর হাত।

এক নিবেদন করে রাজার সাক্ষাত।।

বড় যত্নে করিয়াছি এক জলাসয়।

আজ্ঞা হৈলে উৎসর্গিয়া জাইতে জুক্ত হয়।।

... ... ...

... ... ...

রাজধরে বলে আজি প্রস্তান করিয়া।

কালি জাব জলাসয় উৎসর্গ করিয়া।।

বিদায় করিল পুত্র আসির্ব্বাদ করি।

জলাসয় উৎসর্গ করি ছাড়িল নগরি।।

বর্তমানে অমরসাগরের মতোই এতেও বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট পুকুর তৈরি করে সরকারিভাবে মাছের চাষ করা হচ্ছে।

**৮) মাতাবাড়ির দীঘি (কল্যাণসাগর) :-**

ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দির থেকে পূর্ব দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমেই যে দীঘিটি পাওয়া যায়, তাকে কল্যাণসাগর বলে। দীঘিটি মধ্যম আকারের, দৈর্ঘ্য ৪৪০ হাত, প্রস্থে ২৪০ হাত (শ্রীরাজমালা অনুসারে ২২৪ × ১৬০ গজ)। অমরমাণিক্যের সময় মগ আক্রমণে ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দিরের চূড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কল্যাণমাণিক্য রাজা হওয়ার পর দেবীর মন্দিরের চূড়ার পুনর্নির্মাণ করেন। ওই সময়ে ত্রিপুরসুন্দরী তাঁকে স্বপ্নে জলাশয় দিতে আদেশ করেন বলে রাজমালায় উল্লেখ আছে—

স্বপ্নে কালিকা আসি রাজাকে কহিল।

আমার নিকটে জলাসয় দিতে হৈল।।

অতিকষ্টে আছি আমি জলের কারণে।

... ... ...

... ... ...

বাস্তুর পুজার পরে আরম্ভ করিল।

কালিকার সমিপেত জলাসয় দিল।।

... ... ...

... ... ...

পুষ্করিনি নাম রাখে কল্যাণ সাগর।

কালিকা দেবির পুজা হৈল বহুতর।।

এই দীঘিতে প্রচুর পরিমাণে নানা মাছ ও কচ্ছপ দেখা যায়, প্রতিদিন অসংখ্য পুণ্যার্থী এদের দেখে আনন্দ লাভ করে, কেউ কেউ এদের খাবারও দেয়। এদের ধরা বা হত্যা করা নিষিদ্ধ।

এছাড়া কল্যাণসাগর নামে দক্ষিণ চন্দ্রপুর মৌজায় আরেকটি দীঘি আছে। তবে এই দীঘিটি তুলনায় ছোট (৮০×৪০ গজ)। কসবা অঞ্চলে 'কল্যাণসাগর' নামে একটি দীঘি দেখা যায়। কল্যাণপুরেও তাঁর নির্মিত একটি দীঘি আছে। এ বিষয়ে সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন---"প্রথিতযশাঃ ত্রিপুরাধিপতি কল্যাণমাণিক্য বর্ণিত কল্যাণপুরে যে সমুদয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'কল্যাণসাগর' নামক তদীয় নামসমন্বিত দীর্ঘিকা এবং তাহার তীরদেশে একটি কারুকার্য বিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ তদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সরোবরটি অধুনা এরকাদি জলজ গুল্মলতাতে এরূপ প্রচ্ছাদিত হইয়াছে যে, ইহার সলিল আর দৃষ্টিগোচর হয় না।'

**৯) পুরান দীঘি (জগন্নাথ দীঘি) :-**

দীঘিটির নাম থেকেই বোঝা যায় এই দীঘিটি বেশ প্রাচীন। এই দীঘির দক্ষিণ পাড়ে বর্তমানের কিরীট বিক্রম ইনস্টিটিউশন (কে. বি. আই.) অবস্থিত। দীঘিটি দৈর্ঘ্যে ১৫০৮ হাত, প্রস্থে ৪৩৬ হাত (শ্রীরাজমালা মতে ৭৫৪ × ২১৮ গজ)। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, ওই সময়ে দীঘির উত্তর পাড়ে উদয়পুর বিভাগীয় অফিস স্থাপিত হয়েছিল। এই দীঘির অপর নাম 'জগন্নাথ দীঘি', যা সর্বসাধারণ্যে বহুল প্রচলিত। কিন্তু দীঘির এই নামকরণের কোনও নিশ্চিত উৎস পাওয়া যায় না। শ্রীরাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন এই দীঘি গোবিন্দমাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ দেব খনন করিয়েছিলেন বলে অভিমত প্রকাশ করলেও রাজমালা অথবা শ্রীরাজমালার কোনটিতেই এর পুষ্টি নেই।

অপরপক্ষে, অসম রাজার দুই দূত রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস রাজধানী উদয়পুরের বর্ণনায় একে বিজয়সাগর বলে অভিহিত করেছেন। অমরসাগরের বর্ণনার পর তাঁরা লিখেছেন---'ইহার পশ্চিম দিকে কিছু দূরে আরও একটি দীঘি আছে, এই দীঘির নাম বিজয়সাগর। এই দীঘি বিজয়মাণিক্য রাজা কাটাইয়াছিলেন। বিজয়সাগর দৈর্ঘ্যে আমাদের তেলিয়াডোঙ্গার পুকুরটির মতন বড় হইবে এবং প্রস্থে উহার অর্দ্ধেকের চেয়ে কিছু বড় হইবে। ইহার চারি

পাড়ে নগরের লোকদের বাড়ি আছে। উক্ত দুই দীঘির মধ্যখানে ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, মালী এই সকলের বাড়ি আছে।'

ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী তাঁর 'ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর' গ্রন্থে লিখেছেন—'দূতগণ সম্ভবতঃ পুরাণ দীঘিকে বিজয়সাগর বলে ভুল করেছেন কারণ অমরসাগরের পশ্চিমেই পুরাণ দীঘি ছিল।' কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, অসম রাজার দূতদ্বয় মহাদেববাড়ি এবং তার সংলগ্ন দীঘি (যাকে এখন বিজয়সাগর বলা হয়) এবং ধন্যসাগরের উল্লেখ করেননি। এ থেকে স্পষ্ট যে, ওই সময়ে হয়ত রাজধানী আরও পশ্চিমে সরে এসেছিল, নতুবা তাদের ওইসব অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়নি। যদি মহাদেব বাড়ির দীঘি প্রকৃতই বিজয়সাগর হয়ে থাকে, তবে তা তাঁরা দেখেননি, তাই তাঁদের এই ধরনের ভুল হওয়া খুব একটা স্বাভাবিক নয়। তবে কি ওই সময়ে পুরাণ দীঘি 'বিজয়সাগর' নামেই পরিচিত ছিল?

**১০) ছত্রসাগর :-**

এই দীঘিটি দক্ষিণ চন্দ্রপুর মৌজায় অবস্থিত। গোবিন্দমাণিক্যের ভাই নক্ষত্র রায় 'ছত্রমাণিক্য' নাম ধারণ করে ছয় বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তিনিই এই দীঘিটি খনন করান। এর দৈর্ঘ্য ৫৪০ হাত, প্রস্থ ২৮০ হাত (শ্রীরাজমালা অনুসারে ২৭০ × ১৪০ গজ)। শ্রীরাজমালায় লেখা রয়েছে—

উদয়পুর ছত্রসাগর করিয়া খনন।

বসন্ত হইয়া রাজার হইল মরণ।।

বর্তমানে এই দীঘিটিকে বাঁধ দিয়ে দিয়ে বেশকিছু পুকুরে পরিণত করা হয়েছে। ফলে দীঘির মহিমা অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে।

**১১) রামসাগর :-**

এই দীঘিটি খিলপাড়া মৌজায় অবস্থিত। গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য এই দীঘিটি খনন করান। শ্রীরাজমালায় বলা হয়েছে—

উদয়পুর তিষিনাতে সাগর খনন।

রামসাগর নাম করিল স্থাপন।।

দীঘিটি আকারে ৫০০ × ৩৩০ হাত (শ্রীরাজমালা মতে ২৫০ × ১৬৫ গজ)। দক্ষিণ চন্দ্রপুরে আরেকটি ছোট আকারের (৮০ × ৬০ গজ) রামসাগর আছে।

**১২) মহেন্দ্রসাগর :-**

এই দীঘিটিও খিলপাড়া মৌজায় রামসাগর দীঘিটির পাশাপাশি অবস্থিত। বর্তমানে স্থানীয় লোক এদের একত্রে 'জোড় দীঘি' বলে থাকে। মহেন্দ্রসাগরের আকার ৫৫৯ × ২৮২ হাত (শ্রীরাজমালায় ২৭০ × ১৪০ গজ)।

মহেন্দ্রমাণিক্য (১৭১২-১৩ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর ভাই দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যকে হত্যা করে রাজা হন। তিনিই এই দীঘিটি খনন করান। এ প্রসঙ্গে শ্রীরাজমালায় বলা হয়েছে—

এই মতে আড়াই বৎসর রাজত্ব শাসিল।

উদয়পুরে মহেন্দ্রাদি সাগর খনিল।।

বর্তমানে রামসাগর ও মহেন্দ্রসাগরের উপর দিয়েই রেলপথ নির্মাণ হওয়ায় এদের অস্তিত্ব বিপদের মুখে।

**১৩) নানুয়ার দীঘি :-**

এই দীঘিটি সুখসাগর জলার একপ্রান্তে খিলপাড়া মৌজায় অবস্থিত। এই নানুয়া ছিলেন দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের (১৭১৩-২৯ খ্রিস্টাব্দ) পত্নী, মুদ্রাসাক্ষ্যে তাঁর নাম ধর্মশীলা। মহিমচন্দ্র ঠাকুর এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"নানুয়া ছিলেন মহারাজ দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের পত্নী। নানুয়া তাঁহার ডাক নাম ছিল। পিতামহ মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্য আদর করিয়া নাতি বৌকে 'নানুয়া' নামে ডাকিতেন।" কিন্তু ধর্মমাণিক্য (২য়) মহেন্দ্রমাণিক্যের নাতি ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি মহেন্দ্রমাণিক্যের ভাই ছিলেন। দীঘিটি আকারে ৪৪০ × ২৮০ হাত।

**১৪) ধর্মসাগর :-**

এটি মাতাবাড়ির কাছে বাউস্যাপাড়ায় অবস্থিত। এর আকার ২৬০ × ১২০ হাত। তুলনায় ছোট এই জলাশয়টি ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য দ্বারা খনিত হয়েছিল বলে মনে করেন।

উদয়পুরে আরও অনেক দীঘি আছে। এর মধ্যে কিছু রাজকর্মচারীদের দ্বারা খনিত। এছাড়া জাতি ভিত্তিক বিভিন্ন পল্লীতে প্রচুর দীঘি দেখা যায়।

মহারাজ অমরমাণিক্য-প্রতিষ্ঠিত অমরপুরে দুটি বড় বড় দীঘি আছে। এর মধ্যে একটির নাম অমরসাগর, এটি মহারাজ অমরমাণিক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয় (অবশ্য এই দীঘির নামই এর ইঙ্গিতবাহী), তবে রাজমালা অথবা শ্রীরাজমালায় এই দুটি দীঘির কোনও উল্লেখ নেই। এই অমরসাগরের পূর্ব পাড়ে অমরমাণিক্য দ্বারা নির্মিত একটি ত্রিতল দালানের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

অপর দীঘিটির নাম ফটিক সাগর, নাম দ্বারা এটি কোন্ রাজার কীর্তি তা বোঝা না গেলেও এই দীঘিটিও অমরমাণিক্যই খনন করান বলে শ্রীরাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন মনে করেন। এই দীঘির পশ্চিম ও উত্তর পাড়ে দুটি ভগ্ন মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এছাড়া মহেন্দ্রমাণিক্য কৈলাসহরের রাঙ্গাউটি নামক স্থানে 'মহেন্দ্র সাগর' নামক বিশাল দীঘি খনন করান। সেখানে ঘটা করে প্রতি বছর চৌদ্দ দেবতার পূজা করা হয়।

পার্বত্য ত্রিপুরা ছাড়াও ত্রিপুর রাজারা জমিদারি অঞ্চল চাকলা-রোশনাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চলে বহু দীঘি খনন করিয়েছিলেন। এই সবই প্রজাদের অথবা স্থানীয় লোকদের পানীয় জলের উৎস হিসেবে কাজ করত। এদের মধ্যে কয়েকটির বিবরণ দেওয়া গেল—

**১) জগন্নাথ দীঘি :-**

কুমিল্লা শহরের দক্ষিণে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের পাশে তিল্লা পরগনার কেচকিমুড়া গ্রামে এক বিশাল দীঘি দেখা যায়। এই দীঘিটি গোবিন্দমাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ ঠাকুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরাজমালায় আছে—

জগন্নাথ ঠাকুর অতি পুণ্যবান হয়।
তিষিণাতে দিল দীঘি পুণ্যের সঞ্চয়।।

সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন—'চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ পথপার্শ্বে দীর্ঘিকাটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সম্ভাবিত হয় যে, পরিশ্রান্ত পথিকগণের বিশ্রাম ও পিপাসা নিবারণার্থে এই স্থানে জলাশয়টি খনিত হইয়া থাকিবে।'

জলাশয়টি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল এবং প্রস্থে দৈর্ঘ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

**২) ধর্মসাগর :-**

কুমিল্লা শহরে ধর্মসাগর নামে একটি বিখ্যাত সুবিশাল দীঘি আছে। এর দৈর্ঘ্য ৮৩৪ হাত এবং প্রস্থ ৫৫৪ হাত। এই দীঘিটি প্রথম ধর্মমাণিক্য খনন করান বলে সকলেই বিশ্বাস করেন, কিন্তু তা যে ভুল তা আমরা আগেই জেনেছি। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য (১৭১৩-২৯ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর অভিষেককালে কুমিল্লা শহরে এই দীঘিটি খনন করান। রাজমালায় বলা হয়েছে—

তড়াগ দিবার হৈল মনের বাঞ্ছিত।।

সকলের শ্রেষ্ঠ দিঘি কুমীল্বাতে দিল।

কুমিল্লায় এই ধর্মসাগর ছাড়াও নানুয়ার দীঘি নামে একটি বড় দীঘি আছে। আমরা আগেই দেখেছি দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের পত্নী ধর্মশীলার ডাক নাম ছিল 'নানুয়া'। তিনিই এই দীঘিটি খনন করান। শ্রেণীমালায় আছে—

ধর্ম্মশীলা রানী নামে দীর্ঘিকা খনিল।

কুমিল্লাতে নানুয়ার দীঘি নাম হৈল।।

কুমিল্লায় 'রানীর দীঘি' নামে আরেকটি বড় দীঘি আছে। এই দীঘিটি কৃষ্ণমাণিক্যের পত্নী জাহ্নবী দেবী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

ধন্যমাণিক্য ১৪৩৬ শকে (১৫১৪ খ্রিস্টাব্দ) দ্বিতীয়বার চট্টগ্রাম আক্রমণের সময় আরাকানে একটি দীঘি খনন করান।

রূমু আদি ছরসীকে মারিয়া লইল।

রসাঙ্গা নিকটে জাইয়া পুস্করনি দিল।।

এছাড়া বরদাখাত পরণনায় তিনি আরেকটি দীঘি খনন করান বলে কালীপ্রসন্ন সেন শ্রীরাজমালায় উল্লেখ করেছেন।

উদয়পুরের কমলাসাগর ছাড়াও কসবা মন্দিরের সামনে ধন্যমাণিক্য পত্নী কমলাদেবীর দ্বারা কমলাসাগর নামে একটি দীঘি খনিত হয়েছিল। এই দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়েই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গেছে।

গোবিন্দ মাণিক্য চট্টগ্রামের চন্দ্রশেখর পর্বতের শীর্ষে একটি মঠ নির্মাণ করে

'চন্দ্রনাথ শিব' শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন, অবশ্য সেই মন্দির ভূমিকম্পে বিনষ্ট হলে নতুন করে আবার মন্দির নির্মাণ করা হয়। সীতাকুণ্ড তীর্থে মোহন্তের বাড়ির কাছে তিনি একটি দীঘি খনন করান।

তিয়া পরগণার অন্তর্গত বাতিসা গ্রামে বৈদ্যের বাজার সংলগ্ন একটি স্থানে গোবিন্দমাণিক্য একটি বড় দীঘি খনন করান। এটি 'গোবিন্দ সাগর' নামে পরিচিত।

শ্রীরাজমালায় উল্লেখ আছে---

চট্টলেত চন্দ্রশেখর মঠ নিরমিয়া।

দেবার্থে মহারাজা জলাশয় দিয়া।।

গোবিন্দসাগর নাম করিল তখন।

তিষিনা উদয়পুরে করিছে শোভন।।

এক্ষেত্রে উদয়পুরেও গোবিন্দসাগর নামে একটি দীঘির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই দীঘিটি কোথায়, তা সনাক্ত হয়নি।

গোবিন্দমাণিক্যের পত্নী গুণবতী দেবী কসবা থানা এলাকায় জাজিসার গ্রামে 'গুণসাগর' নামে একটি দীঘি খনন করান। অজ্ঞানতাবশত কেউ কেউ একে গুণমাণিক্যের দীঘি বলে, একথা শ্রীরাজমালা সম্পাদক জানিয়েছেন।

রামমাণিক্যের শ্যালক যুবরাজ বলিভীম নারায়ণ রামমাণিক্যের মৃত্যুর পর নাবালক রাজা রত্নমাণিক্যের অভিভাবক হিসেবে শাসনভার কিছুদিন নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ওই সময়ে তিনি কসবার মন্দিরের সংস্কার, দীঘি খনন ইত্যাদি করেছিলেন। বিলোনীয়ার পিলাক পাথর গ্রামে একটি দীঘি খনন করিয়েছিলেন। এটি 'বলিনারায়ণ দীঘি' নামে প্রসিদ্ধ। সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন---'উল্লিখিত গ্রামের উত্তর দিকে প্রবাহিত মুহুরী নদীর সন্নিহিত বলিভীম নারায়ণের নাম সমন্বিত একটি দীর্ঘিকা আছে। এই স্থান নিবাসী জনসাধারণ কর্তৃক কথিত হয় যে, ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দমাণিক্যের তনয় নৃপাল রামমাণিক্যের শ্যালক বলিভীম নারায়ণ এই স্থানে বাস করিবার সময় দীর্ঘিকাটি খনন করাইয়াছিলেন।'

এছাড়া বলিভীম নারায়ণ মেহেরকুল পরগণার দুর্গাপুর গ্রামেও একটি দীঘি খনন করিয়েছিলেন। শ্রীরাজমালায় বলা হয়েছে—

বলিভীম যুবরাজ পুণ্য আচরণ।

মেহারকুল দুর্গাপুরে দীঘি করিল খনন।।

অমরমাণিক্যের আমলে শ্রীহট্ট বিজয়কালে পুত্র রাজধর (পরে রাজধর মাণিক্য) শ্রীহট্টে রাজধর দীঘি নামে একটি বড় দীঘি খনন করান। রাজমালায় আছে—

রাজধর নারায়ণ শ্রীহট্টে গেল।

আদি রাজধ[র] নামে দীর্ঘিকা দিল।।

এক্ষেত্রে রাজধর দীঘির আগে 'আদি' শব্দটি লাগানোর অর্থ পূর্ববর্তী রাজধরের দীঘি, যিনি রাজধরমাণিক্য হিসেবে ১৫৮৬-৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

মুকুন্দমাণিক্য (১৭২৯-৩৯ খ্রিস্টাব্দ) তিয়া পরগণার ফাল্গুনকরা গ্রামে মুকুন্দসাগর নামে একটি দীঘি খনন করিয়েছিলেন। বর্তমানে এটি 'ফাল্গুনকরার দীঘি' নামে পরিচিত। শ্রীরাজমালায় বলা হয়েছে—

উদয়পুর তিষিণা ফাগুনকরা গ্রাম।

সাগর খনিল রাজা মুকুন্দসাগর নাম।।

এখানে উদয়পুরের কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু গোবিন্দসাগরের মত এটিও সনাক্ত করা যায়নি।

শ্রীরাজমালা অনুসারে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য (১৭১৩-২৯ খ্রিস্টাব্দ) কুমিল্লার ধর্মসাগর ছাড়াও আরও তিনটি ধর্মসাগর খনন করেন—

মেহেরকুল ছত্রগ্রাম কসবা ধর্ম্মপুর।

স্থানে স্থনে খনিল ধর্ম্ম নামেত সাগর।।

কসবায় ধর্মসাগরের অস্তিত্ব কৈলাসচন্দ্র সিংহ সমর্থন করেছেন, কিন্তু ছত্রগ্রাম

ও ধর্মপুরে ধর্মসাগরের অস্তিত্বের বিবরণ অথবা স্থানগুলি সম্পর্কে কেউ আলোচনা করেননি।

শ্রীরাজমালা থেকে স্পষ্ট যে, উদয়পুরে এই দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য ধর্মসাগর খনন করাননি। তবে মাতাবাড়ি অঞ্চলের ধর্মসাগর কে খনন করিয়েছিলেন? এটা কি প্রথম ধর্মমাণিক্যের ধর্মসাগর?

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য আখাউড়ার নিকটস্থ কালিকাগঞ্জে (পরে রাধানগর) পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণের সময় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি বৃহৎ দীঘি খনন করিয়ে ছিলেন। এর একটি কৃষ্ণসাগর এবং অপরটি জাহ্নবীসাগর নামে পরিচিত।

মহারাজ দুর্গামাণিক্য (১৮০৯-১৩ খ্রিস্টাব্দ) কাশীতে জোড়া শিবমন্দির নির্মাণ করেন, সীতাকুণ্ডের কাছে দুর্গাপুর গ্রাম স্থাপন করে সেখানে জগন্নাথ মন্দির স্থাপন করেন। তাঁর পত্নী সুমিত্রা দেবী মায়ের নামে নূরনগরে একটি দীঘি খনন করান।

মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য (১৮০৪-০৯, ১৮১৩-২৬ খ্রিস্টাব্দ) বৃন্দাবনে রাসবিহারীর কুঞ্জ নির্মাণ করেন, মাইজঘরে মন্দির নির্মাণ করে তাতে করুণাময়ী কালী মূর্তি স্থাপন করেন। পুরাতন আগরতলায় ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। তিনি মোগরায় গঙ্গাসাগর নামে এক দীঘি স্থাপন করেন। বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমল পর্যন্ত রাজবাড়ির জন্য এই দীঘি থেকে জল আনা হত বলে ড. জগদীশ গণচৌধুরী জানিয়েছেন।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য যখন পুরাতন আগরতলা থেকে বর্তমান আগরতলায় রাজধানী স্থাপন করেন তখন তিনি রাজবাড়ির সামনে কৃষ্ণসাগর নামে একটি দীঘি খনন করান। দীঘিটি ১৮৪০ সালে খনিত হয় বলে শ্রেণীমালায় উল্লেখ আছে—

বারশ' পঞ্চাশ সন ত্রিপুরার হৈল।

হাবেলী দক্ষিণ ভাগে দীর্ঘিকা খনাইল।।

১৮৯৭ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ফলে ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের নির্মিত রাজপ্রাসাদ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাধাকিশোরমাণিক্য (১৮৯৬-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) বর্তমান রাজপ্রাসাদ নির্মাণের সময় এই কৃষ্ণসাগর দীঘির উত্তরাংশ

ভরাট করে একে আরও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরিয়ে এনে আরও বড় আকারে খনন করেন। মাঝখানে কিছু জায়গা বাদ দিয়ে এর পূর্বদিকে সমসূত্রে একই আকারের আরেকটি দীঘি খনন করা হয় এবং মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের নামানুসারে দীঘির নামকরণ 'রাধাসাগর' হয়। বর্তমানে কৃষ্ণসাগরকে সবাই 'দুর্গাবাড়ি দীঘি' এবং রাধাসাগরকে 'লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি দীঘি' বলে চেনে।

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের আমল থেকে সর্বসাধারণের পানীয় জলের উৎস হিসেবে প্রচুর দীঘি/পুকুর কাটা হয়। এই ধরনের কাজ সবচেয়ে বেগবান হয় মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের আমলে। আগরতলার বিভিন্ন লোকালয়ে যেমন বনমালীপুরের দীঘি, বোধজং গালর্স স্কুলের সামনের দীঘি (যা মণি দীঘি নামে পরিচিত), মেলারমাঠের দীঘি, জয়নগর মধ্য রাস্তার দীঘি, অফিস লেনে বর্তমান টিএনজিসি অফিসের পেছনের দীঘি, রামনগর সাত নম্বরের শেষ মাথার দীঘি, আস্তাবলের কাছে ডিমসাগর ইত্যাদি দীঘি ত্রিপুরার রাজাদেরই কীর্তি। এই সকল দীঘিই রাজধানী আগরতলার নাগরিকদের পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

# ৬

# গ্রন্থ-সূত্র

## প্রথম অধ্যায় (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য)

১। অন্য বীরবিক্রম, পান্নালাল রায়, পৌণমী প্রকাশন, হাসপাতাল রোড, আগরতলা, জানুয়ারি, ২০০৬ ইং

২। আধুনিক ত্রিপুরা—প্রসঙ্গ বীরচন্দ্রমাণিক্য, ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী, অক্ষর পাবলিকেশনস, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ২০০৭ ইং

৩। আধুনিক ত্রিপুরা—প্রসঙ্গ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী, অক্ষর পাবলিকেশনস, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ২০০২ ইং

৪। আবর্জনার ঝুড়ি, নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ২০০৪ ইং

৫। উজ্জয়ন্ত, স্মরণিকা, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের ১০০ বছর পূর্তি উৎসব; তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি, ২০০১ ইং

৬। উদয়পুর বিবরণ, শ্রী ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, রাজ্য শিক্ষা বিভাগীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

৭। ত্রিপুরার ইতিহাস, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, ১৯৮২ ইং

৮। ত্রিপুরার ইতিহাস, ড. জগদীশ গণচৌধুরী, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, আগরতলা, ২০০০ ইং

৯। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী, পারুল প্রকাশনী, ১৬, আখাউড়া রোড, আগরতলা, ১ জানুয়ারি, ২০০৪ ইং

১০। ত্রিপুরার প্রাচীন পুঁথি প্রসঙ্গে, রমা প্রসাদ দত্ত, পৌণমী প্রকাশন, হাসপাতাল রোড, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৯ ইং

১১। ত্রিপুরার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, মোহিত পুরকায়স্থ, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ৬/১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৮ ইং

১২। ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, ড. শিশির কুমার সিংহ, অক্ষর পাবলিকেশনস, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, জানুয়ারি, ২০১৮ ইং

১৩। ত্রিপুরার স্মৃতি, সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা দর্পণ, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা, ১৯৯৯ ইং

১৪। ত্রিপুরার রাজসভা শিল্পী, বিকচ চৌধুরী, ত্রিপুরা দর্পণ, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা, ২০০১ ইং

১৫। দেশীয় রাজ্য, স্বর্গীয় কর্নেল মহিম চন্দ্র ঠাকুর (দেববর্মা), ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইবেল কালচারেল ইনস্টিটিউট এন্ড মিউজিয়াম, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ১৯৯৬ ইং

১৬। পঞ্চমাণিক্য, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ১৯৯৬ ইং

১৭। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা, বিকচ চৌধুরী, ত্রিপুরা দর্পণ, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা, ২০০১ ইং

১৮। রাজমালা (রামনারায়ণ দেব), শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, জুন ১৯৬৭ ইং

১৯। রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, কৈলাস চন্দ্র সিংহ, অক্ষর পাবলিকেশনস, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

২০। রামায়ণ চর্চা : ভারতে ও বহির্ভারতে, সম্পাদনা তাপস ভৌমিক, কোরক, দেশবন্ধু নগর, ইএ ১/৮, বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০০৫৯, জানুয়ারি, ২০১০ ইং

২১। শ্রীরাজমালা, সম্পাদনা শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ (নব কলেবর, একত্রিত সংস্করণ, সম্পাদনা রমেন্দ্র বর্মণ), নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২৫শে বৈশাখ, ১৪১০

২২। শ্রেণীমালা, দুর্গামণি উজীর, সম্পাদনা বিদ্যা বাচস্পতি মহারাজকুমার সহদেব

বিক্রম কিশোর দেববর্মণ ও ডাঃ জগদীশ গণচৌধুরী, ত্রিপুরা উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ ইং

২৩। রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, সম্পাদনা শ্রী দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও শ্রী সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, আগরতলা, মে ১৯৭৬ ইং

## দ্বিতীয় অধ্যায় (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য)

১। অন্য বীরবিক্রম, পান্নালাল রায়, পৌণমী প্রকাশন, হাসপাতাল রোড, আগরতলা, জানুয়ারি, ২০০৬ ইং

২। আধুনিক ত্রিপুরা : প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য, ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী, অক্ষর পাবলিকেশনস, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ২০০৫ ইং

৩। আবর্জনার ঝুড়ি, নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ২০০৪ ইং

৪। ত্রিপুর দেশের কথা (১৬২৬-১৭১৫ খ্রীঃ), রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস লিখিত, সম্পাদনা ত্রিপুর চন্দ্র সেন, উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ১৯৯৭ ইং

৫। ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন (১৯০৩-১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ), শ্রী সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, নভেম্বর, ১৯৭১ ইং

৬। পুর সংবাদ, বিশেষ সংখ্যা (আগরতলা পুরসভার ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে), আগরতলা পুর পরিষদ, জুলাই, ১৯৯৮ ইং

৭। রাজমালা (রামনারায়ণ দেব), শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, জুন ১৯৬৭ ইং

৮। রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, সম্পাদনা শ্রী দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও শ্রী সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, আগরতলা, মে ১৯৭৬ ইং

৯। শতবর্ষ স্মরণিকা (১৮৯৪-১৯৯৪), মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা, ১৯৯৪ ইং

১০। সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা (১৯৪৭-১৯৯৭), মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়, আগরতলা, ১৯৯৭ ইং

১১। Administration Report of the Political Agency, Hill Tipperah, 1872-1877-78, Vol-I, Editor Dipak Kumar Chaudhuri, Tripura State Tribal Cultural Research Institute & Museum, Govt. of Tripura, Agartala, January 1996

১২। Administration Report of the Political Agency, Hill Tipperah, 1878-79-1890, Vol-II, Editor Dipak Kumar Chaudhuri, Tripura State Tribal Cultural Research Institute & Museum, Govt. of Tripura, Agartala, March 1996

১৩। Adminstration Report of Tripura State, Vol-I, Edited by Mahadeb Chakraborty, Gyan Publishing House, New Delhi-110002, 1994

১৪। Adminstration Report of Tripura State, Vol-II, Edited by Mahadeb Chakraborty, Gyan Publishing House, New Delhi-110002, 1994

১৫। Adminstration Report of Tripura State, Vol-III, Edited by Mahadeb Chakraborty, Gyan Publishing House, New Delhi-110002, 1994

১৬। Adminstration Report of Tripura State, Vol-IV, Edited by Mahadeb Chakraborty, Gyan Publishing House, New Delhi-110002, 1994

১৭। Report on the Administration of the Tripura State (1898-99, 1899-1900, 1943-46), Ranjit Kumar Dey, Tara Book Agency, Kamachha, Varanasi-221010, February, 1997

১৮। Report on the Administration of the State of Tipperah for the year 1300 TE (13th April 1890-12th April 1891), Tribal Research and Cultural Institute, Govt. of Tripura, Agartala, December, 2004

১৯। The Administration Report of Tripura State (For the year 1894-95, 1914-15 & 1918-19), Compiled & Edited by Dr. D. N. Goswami & Sri

Arun Debbarma, Tribal Research Institute, Govt. of Tripura, Agartala, December 2004

২০। Tripura State Administration Report (1904-05, 1906-07, 1907-08), Edited by Dr. D. N. Goswami & Arun Debbarma, Tribal Research & Cultural Institute, Govt. of Tripura, Agartala, March 2007

## তৃতীয় অধ্যায় (স্থাপত্য-শিল্প)

১। আগরতলার ইতিবৃত্ত, জগদীশ গণচৌধুরী, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

২। উদয়পুর বিবরণ, শ্রী ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, রাজ্য শিক্ষা বিভাগীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

৩। ত্রিপুর দেশের কথা (১৬২৬-১৭১৫ খ্রীঃ), রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস লিখিত, সম্পাদনা ত্রিপুর চন্দ্র সেন, উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ১৯৯৭ ইং

৪। ত্রিপুরার ইতিহাস, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, ১৯৮২ ইং

৫। ত্রিপুরার ইতিহাস, ড. জগদীশ গণচৌধুরী, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, আগরতলা, ২০০০ ইং

৬। ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর, দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী, ডাইরেক্টরেট অব রিসার্চ, ডিপার্টমেন্ট অব ওয়েলফেয়ার ফর শিডিউল্ড ট্রাইবস, গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরা, আগরতলা, মার্চ ১৯৯২ ইং

৭। ত্রিপুরার স্মৃতি, সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা দর্পণ, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা, ১৯৯৯ ইং

৮। পুর সংবাদ, বিশেষ সংখ্যা (আগরতলা পুরসভার ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে), আগরতলা পুর পরিষদ, জুলাই, ১৯৯৮ ইং

৯। পুরাতনী ত্রিপুরা, জহর আচার্জী, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ১১ জগন্নাথ বাড়ী রোড, আগরতলা, ২০০৮ ইং

১০। রাজমালা (রামনারায়ণ দেব), শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, জুন ১৯৬৭ ইং

১১। ঐতিহ্যের উদয়পুর/এক, পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী, অববাহিকা প্রকাশনী, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা, অক্টোবর ২০০৬ ইং

১২। রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, কৈলাস চন্দ্র সিংহ, অক্ষর পাবলিকেশনস, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

১৩। শ্রীরাজমালা, সম্পাদনা শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ (নব কলেবর, একত্রিত সংস্করণ, সম্পাদনা রমেন্দ্র বর্মণ), নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২৫শে বৈশাখ, ১৪১০

১৪। Adminstration Report of Tripura State, Vol-II, Edited by Mahadeb Chakraborty, Gyan Publishing House, New Delhi-110002, 1994

১৫। Temples of Tripura, Dr. D. N. Goswami, Akhsar Publications, Jagannath Bari Road, Agartala, January 2003

১৬। Tripura District Gazetteers, K. D. Menon, Govt. of Tripura, Agartala, 1975

১৭। UDAIPUR, Edited by Asit Datta, Information, Cultural & Tourism Department, Govt. of Tripura, Agartala, January, 2001

## চতুর্থ অধ্যায় (জলাশয়)

১। আগরতলার ইতিবৃত্ত, জগদীশ গণচৌধুরী, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

২। উজ্জয়ন্ত, স্মরণিকা, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের ১০০ বছর পূর্তি উৎসব; তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি, ২০০১ ইং

৩। উদয়পুর বিবরণ, শ্রী ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, রাজ্য শিক্ষা বিভাগীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

৪। ত্রিপুরার ইতিহাস, ড. জগদীশ গণচৌধুরী, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, আগরতলা, ২০০০ ইং

৫। ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর, দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী, ডাইরেক্টরেট অব রিসার্চ, ডিপার্টমেন্ট অব ওয়েলফেয়ার ফর শিডিউল্ড ট্রাইবস, গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরা, আগরতলা, মার্চ ১৯৯২ ইং

৬। ত্রিপুর দেশের কথা (১৬২৬-১৭১৫ খ্রীঃ), রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস লিখিত, সম্পাদনা ত্রিপুর চন্দ্র সেন, উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ১৯৯৭ ইং

৭। ত্রিপুরার স্মৃতি, সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা দর্পণ, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা, ১৯৯৯ ইং

৮। দেশীয় রাজ্য, স্বর্গীয় কর্নেল মহিম চন্দ্র ঠাকুর (দেববর্মা), ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইবেল কালচারেল ইনস্টিটিউট এন্ড মিউজিয়াম, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ১৯৯৬ ইং

৯। পুরাতনী ত্রিপুরা, জহর আচার্জী, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ১১ জগন্নাথ বাড়ী রোড, আগরতলা, ২০০৮ ইং

১০। রাজমালা (রামনারায়ণ দেব), শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, জুন ১৯৬৭ ইং

১১। রাজমালা, মৃণালকান্তি দেবরায়, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ১১ জগন্নাথ বাড়ী রোড, আগরতলা, জানুয়ারি, ২০০৮ ইং

১২। শ্রীরাজমালা, সম্পাদনা শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ (নব কলেবর, একত্রিত সংস্করণ, সম্পাদনা রমেন্দ্র বর্মণ), নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২৫শে বৈশাখ, ১৪১০

১৩। শ্রেণীমালা, দুর্গামণি উজীর, সম্পাদনা বিদ্যা বাচস্পতি মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মণ ও ডাঃ জগদীশ গণচৌধুরী, ত্রিপুরা উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ ইং

১৪। স্মরণিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, ফটিকরায়, কৈলাশহর, ২০০০ ইং

ISBN : 978-93-86707-28-4
Price : Rs. 133/-